প্রকাশিকা—
শ্রীহেমকামিনী দত্তচৌধুরী
শিলং।

পুনর্মুদ্রণ :—
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭ সাল।

নিবেদন

প্রকাশের সঙ্গেই প্রায় প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সময়মত নূতন সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হয় নাই, সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ উপস্থিত করিলাম। আশা করি ইহাও পাঠকদের সম্বর্ধনা লাভ করিবে।

২৫শে বৈশাখ
১৩৬৭ সাল

প্রকাশিকা

সূচী

২৫শে বৈশাখ

কবি-স্মরণে—

– উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী—

রবীন্দ্রনাথ

যে রোমান্টিক কল্পনা ও লিরিক শিল্পভঙ্গি বিহারীলাল বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা বর্ণেগন্ধে রূপেরসে আরো বিচিত্র ও ব্যাপক হইয়া দেখা দিল। রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক ভাববিলাস একটি সুসম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে; আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যও কবির রচনায় সর্বাঙ্গীণ ভাবমাধুর্যে ও শিল্পসুষমায় দেখা দিয়াছে। আধুনিক বিশ্বের রোমান্টিক সাহিত্য তার সর্বাঙ্গীন কল্পনা-বৈচিত্র্যে ও লিপিনৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া দেখা গেল। বর্তমান যুগের রোমান্টিক সাহিত্যের এই শেষ ও চরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে: ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে রোমান্টিক কল্পনা আত্মপ্রকাশ করিল বাংলাদেশের কবির লিরিক কাব্যে যেন ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। বিশ্বসাহিত্যের রোমান্টিক ধারা সকল বৈচিত্র্যে সৌরভে বর্ণেসঙ্গীতে রবীন্দ্রকাব্যে যেন আপনাকে নিঃশেষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। বিশ্বের শিক্ষিত সমাজের কল্পনাবিলাস ও ভাবানুভূতি যে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে রবীন্দ্রকাব্য ইহারই অবিচ্ছিন্ন সর্বোত্তম অংশ। বাংলার আধুনিক কাব্যধারাকে আশ্রয় করিয়া কবির কাব্য বাঙালীর

কল্পনা-লোকের সীমানা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ঃ ভাবে ভাষায় ও কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য নূতন আস্বাদ বহন করিলেও প্রচলিত বাংলা কাব্যপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই ইহা চলিয়াছে ঃ তবে কবির কল্পনায় এমন একটি উদাব প্রসারতা, মধুব সৌন্দর্য রহিয়াছে যাহা আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মনে সকল দেশে একটি সহজ সাড়া জাগাইয়া দিতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার হইয়াও বিশ্বের, আধুনিক বিশ্বেব শিক্ষিত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ। তার কাব্যে ঘর ও বাহির, দেশ ও দেশান্তব স্বদেশ ও বিশ্ব পূর্ব ও পশ্চিম ভাবলোকের মধুর মেদুব পরিবেশে মিলিত হইয়া গিয়াছে ঃ কবির কল্পনা বর্ত্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও মতবাদ হইতে প্রেরণা লাভ কবিয়া ‘মহামানবের সাগরতীরে’ পৃথিবীর সকল মানুষেব মহামিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্নবিলাসী কবির রোমান্টিক কল্পনা তার জীবন, আদর্শ ও মানবতার চিন্তাকেও এক অতীন্দ্রিয় সুষমায় অস্পষ্ট সুদূব বেদনাবিধুর করিয়া তুলিয়াছে। বিহারীলালের মতো রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের অজস্র বিবোধ ও বৈচিত্র্যের ভিতর সঙ্গতি মিলন সমন্বয় কল্পনা করিয়া আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছেন। বিশ্বজীবনের অন্তরালে প্রেম ও সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সূক্ষ্ম সুকুমার মাধুর্যে রবীন্দ্রকাব্যে এক অপূর্ব বর্ণসুষমা ছড়াইয়া দিয়াছে। কবির কল্পনা মিষ্টিক অনুভূতির ইন্দ্রধনুর বর্ণ-ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল ঃ রবীন্দ্রনাথ মানসলোক ও বাস্তবজীবন, ইন্দ্রিয়ভোগের ঐশ্বর্য

ও অতীন্দ্রিয় মানসসৌন্দর্যের মধ্যে কল্পনা দিয়া ভাবসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য অনুভব করিয়াছেন ; মানবতা ও অতীন্দ্রিয়তা সমগ্র অখণ্ড সুসম্পূর্ণ বিশ্বজীবনের দুইটি অবিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি।, ভাষায় ও ছন্দে, ভাবে ও কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য যে শিল্পসুষমা ও মাধুর্য লাভ করিয়াছে বাংলা-সাহিত্যে তাহা অভিনব ঃ একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল সরসতা সজীবতা মহারণ্যের পত্রপল্লবের শ্যামলিমার মতো সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে ওতপ্রোত। এই সর্বব্যাপী সরসতা আরো দুইজন আধুনিক কবির কাব্যে পূর্বযুগে পাই ঃ তারা মাইকেল মধুসূদন ও বিহারীলাল। এই অম্লান নবীন সজীবতা ও প্রাণময়তা রবীন্দ্রনাথের লিরিকগুলির রোমান্টিক মাধুর্যকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার অনবদ্য সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ

ছাতারে মুখরযুগে যে শুনালো চকোরের গান,
করিল যে করাল যে জনে জনে ইন্দ্রসুধাপান,
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,
নমস্কার, করি নমস্কার

—নমস্কার

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশসঙ্গীতে যে তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে তাহা পাইনা ঃ কিন্তু এইগুলিতে গভীর লিরিক-ভাব-মাধুর্য রহিয়াছে ;

সূক্ষ্ম সুকুমার মধুর অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত আনন্দনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এই গানে আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও উষ্ণতা আছে, অনুভূতির মাধুর্য ও সুষমা এই গানগুলিকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। দেশপ্রেমেব প্রথম আবির্ভাবের কলকল্লোলে হেম-নবীনের রচনা মুখরিত উদ্বেল ও উচ্ছ্বসিত। প্রথম জোয়ারের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে প্রশমিত হইয়া রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার প্রচেষ্টায় সংহত হইয়া আসিল। বাঙালীব দেশপ্রেম শিক্ষিত সমাজের সীমাবদ্ধ সংগঠনে সংযত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে। স্বদেশীযুগে ইহার তীব্রতা ও ব্যাপকতা বাড়িলেও ইহা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল, ইহাব সমগ্র জাতীয় রূপটি তখনো প্রকটিত হয় নাই। দেশপ্রেমের এই মধুর মার্জিত সংযত ও সংহত প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে দেখি। রবীন্দ্রনাথের যে কল্পনা অসীমের অদৃশ্য দিগন্তে উধাও হইয়া অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সন্ধানে চলিয়াছে তাহা কবির সকল ভাব ও অনুভূতিকে কোনো সংকীর্ণ আবেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় নাই ঃ কবির দেশপ্রেম নিবিড় গভীর হইয়াও উদাব মুক্ত প্রসারিত; কবির বিশ্ববোধ তার সমগ্র কল্পনাকে প্রশস্ত গণ্ডীমুক্ত করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল যে তত্ত্ব—মিলন ও সমন্বয়, জানাঅজানার লীলাভিসার, সীমা অসীমের আনাগোনা, তাহা কবির সকল

গীতিকাব্যের কল্পনায় ও অনুভূতিতে একটা ব্যাপ্তি ও প্রসারতা আনিয়া দিয়াছে। তার দেশানুভূতি বিশ্বানুভূতিতে লীন হইয়া যায়ঃ স্বদেশ যে বিশ্বেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ ; ব্যক্তির জীবন বিশ্বজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ব্যাপক উদার বলিয়া তার দেশপ্রেমের অনুভূতি কোথাও রুদ্ধ হইয়া সংকীর্ণ আবেগে প্রচণ্ড দুর্দম হইয়া উঠে নাই। ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ যাত্রার পথিক কবির বিচিত্র অনুভূতিগুলিঃ তারা মাটির পৃথিবীর রূপে বর্ণে গন্ধে গানে সমৃদ্ধ হইয়াও আকাশের পানে মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের লিরিক রচনায় এমন একটি কোমলতা ও কমনীয়তা আছে যাহা কবির ভাবগুলিকে সহজেই এক উদার মাধুর্যে ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে প্রাত্যহিক জীবনেব পরিচিত অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া দেয়ঃ বস্তু-সম্পর্কের বন্ধন হইতে অনুভূতিগুলি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়া ভাবলোকের সীমাহীন আকাশের ছায়াপথে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। বিশ্ববোধের স্পর্শে ববীন্দ্রনাথেব দেশাত্মবোধ প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। কবির স্বদেশ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত নয়ঃ বিরাট বিপুল বিশ্বজীবনের সর্বব্যাপী প্রাণধারা তাব স্বদেশকেও সঞ্জীবিত করিতেছে ; কবির দেশ বিশ্বেরই অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন একটি অংশ ; বিশ্ববিচ্ছিন্ন স্বদেশের কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেন নাই, সংকীর্ণ আত্ম-সর্বস্ব দেশ-প্রীতি কবির সর্বানুভূতিকে পীড়িত করে বলিয়া ভারতবর্ষকে তিনি

বিরাট বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, পৃথিবীর সহিত স্বদেশের যোগাযোগ অনুভব করিয়াছেন। সামাজিক রাজনৈতিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় রামমোহন বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজকে যে উদার প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথেব কাব্যে ও নাটকে সাহিত্যে ও সঙ্গীতে তাহা কল্পনা ও অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হইয়া আরো বিচিত্র ও প্রসারিত হইল। কবিব বিশ্বানুভূতি বিপুল অস্পষ্ট রহস্যঘন কল্পনাবিলাস বলিয়া মনে হইলেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতিকাব্য এই সর্বানুভূতিতে উষ্ণ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কবির দেশপ্রীতি বিশ্ববোধ হইতে উৎসারিত হইতেছে। ব্যাপক হইয়াও ইহা প্রগাঢ়, উদার হইয়াও ইহা আন্তরিক : এ দেশপ্রীতি কখনো কোথাও সংকীর্ণসাম্প্রদায়িক ভাবোচ্ছ্বাসে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই।

হে মোর চিত্ত পুণ্য-তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।

* * *

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। —ভারততীর্থ

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কি বেশে !
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে দেখিনু তোমারে স্বদেশে !
ললাট তোমার নীল নভোতল, বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিস সম হিমাচল, তব বরাভয় কর,
সাগর তোমার পরশি চরণ, পদধূলি সদা করিছে হরণ.
জাহ্নবী তব হার-আভরণ দুলিছে বক্ষপর।

—স্বদেশ

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনাগঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।

* * *

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী ;
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।

—ভারতবিধাতা

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার অনুভূতির অঙ্গীভূত ছিল তার দেশপ্রীতি। তবু কবি ঊনবিংশ শতকের অন্যান্য বাঙ্গালী কবিদের মতো প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরব বোধ করিয়া আধুনিক যুগে ইহার পুনরভ্যুত্থান কামনা করিয়াছেন : কল্পনায়

প্রাচীন ভারতের অতীত সমৃদ্ধির সরলতা ও সমারোহের অত্যুজ্জ্বল চিত্র কবি আঁকিয়াছেন; অতীতের শুভ্রশুচি সুন্দর শান্ত জীবনধারাকে আবার আধুনিক যুগে ফিরিয়া পাইবার একটি তীব্র আকুলতা কবির লক্ষ্য করি। অতীত যুগের প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশেষ কোনো রীতি-নীতি সংস্কার বা বিধান রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে নাই; সুদূর অতীতের ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের যে সামগ্রিক রূপটি কবি কল্পনা করিয়াছেন, তার শান্ত সুন্দর শুভ্র মধুর অন্তর্নিহিত সুরটিই কবিকে আকর্ষণ করে। আধুনিক যুগের জটিল দ্বন্দ্বমুখর জীবন-পরিবেশের বিভ্রান্তি বিরোধ মলিনতা অশান্তি কবিকে অতীত ভারতের শান্ত মধুর স্নিগ্ধ শুদ্ধ আশ্রমজীবনেব দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আধুনিক যুগকে কবি উপেক্ষা করেন নাই: ইহার বৈচিত্র্য ও বিপুলতা সংস্কৃতি ও সভ্যতা সাহিত্য ও শিল্প, দেশপ্রীতি ও বিশ্বমিলনের আদর্শ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে; কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষে মানুষে হানাহানি, বিশ্বযুদ্ধ ও সভ্যতার সংকট, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ, প্রাণহীন শুষ্ক বিচার ও যুক্তিবাদ কবিকে প্রাচীন ভারতের ধ্যানগম্ভীর ভাবনিবিড় শান্ত-সমাহিত তপোবনের স্নিগ্ধমধুর শুভ্রশুদ্ধ জীবন—আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন ভারতের আশ্রমজীবনের বিশেষ ভঙ্গিটিকে কবি শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহাকেই আধুনিক যুগের কর্মমুখর ধূলিধূসর চিরচঞ্চল জীবন পরিবেশে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মানবমনীষার নিত্য নূতন আত্মপ্রকাশ ও আবিষ্কার কখনো উপেক্ষা না করিলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র জাগতিক ব্যাপারে ও ঐহিক সমস্যার সমাধানে প্রাণহীন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। অনুভূতি ও বিশ্বাস কল্পনা ও অভিজ্ঞতা কবির উদাব জীবনদর্শনকে মোহময় ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের মানস সাধনায় যে বিশ্বজীবনবোধের সক্রিয় প্রয়াস ছিল কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই সর্বানুভূতিব কামনা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেব বিলুপ্ত সমাজ ও সভ্যতার সহিত কবিমানসের সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের, প্রাচীন জীবনের প্রতি কেবলমাত্র অন্ধসংস্কারেব নয়। আধুনিক বিশ্বের রোমান্টিক সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের অতীত গৌরবগরিমার প্রশস্তিতে পূর্ণ: আধুনিক যুগের রোমান্টিক কাব্য অতীতের বিলুপ্ত শান্তিসমৃদ্ধির কল্পনা করিয়া বেদনাবিধুর হইয়া উঠিয়াছে; সুদূব কল্পনায় সুন্দব ও মধুর, স্বপ্নময় ও রোমান্টিক। অতীতের হারানো দিনগুলি কবিকল্পনাকে স্বপ্নমুখর ও বেদনাবিহ্বল করিয়া দেয়। হিন্দু যুগের অতীত গরিমা স্মরণ করিয়া আধুনিক বাঙালী কবিরা ব্যথিত হইয়াছেন ও গৌরব বোধ করিয়া আত্মসচেতন হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে 'হিন্দুরি-ভাইভেল' এর প্রেরণা ছিল; তবু কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন

একটি বিপুল উদারতা ও প্রসারতা ছিল যাহা গুপ্তকবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতিতে দেখিনা। প্রাচীন ভারতের তপোবনে উদার মানবতা ও বিশ্বানুভূতির যে মহা বাণী একদিন উচ্চারিত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইল; তার সমগ্র প্রাণসত্ত্বায় এই বিশ্ববোধ ওতপ্রোত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক সংস্কার রীতিনীতির প্রতি তাচ্ছিল্য লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য বাঙ্গালী কবিরা ব্যথিত বিরক্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রচলিত প্রাচীন সংস্কার প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য তারা আধুনিক সভ্যতাকে সর্বতোভাবে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই: বর্তমান যুগকে তাঁরা শঙ্কা ও সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন: নৈতিক ও সামাজিক জীবনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অনিবার্য দুর্বার প্রভাব ও পরিবর্তন স্থবির কুসংস্কারপূর্ণ প্রথাগত ভারতীয় জীবনধারায় যে বিপর্যয় আনিয়া দিল তাহা লক্ষ্য করিয়া আধুনিক কবিরা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। নবযুগের ক্রমোদ্ভিন্ন নবীন জীবনপরিবেশ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই শঙ্কিত হন নাই: মানবতার আদর্শ, মনুষ্যত্ব ও মানব-সংস্কৃতিতে তার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আধুনিক যুগের মানুষের ভুলত্রুটি মানবতার বিরোধী কর্ম ও চিন্তাধারা দেখিয়া ব্যথিত হইলেও কবি বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসভ্যতাকে

কখনো অবিশ্বাস উপেক্ষা করেন নাই। প্রাচীন ভারতের সহিত তার সম্পর্ক ছিল অন্তরের অনুভূতির ও আদর্শের ঃ কোনো আচার ও সংস্কারের প্রতি অকারণ মোহ ও অন্ধ ভক্তি হইতে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা জাগে নাই ঃ অতীত যুগের নিভৃত নির্জন তপোবনের শান্তশুদ্ধ পরিবেশে ঋষিদের উদার উন্মুক্ত জীবনবোধও বিশ্বানুভূতির রহস্যময় অতীন্দ্রিয় মধুর গম্ভীর চেতনা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশ্বমানবতার উদার আদর্শ ও ভাবসমৃদ্ধ ধ্যানগম্ভীর আশ্রমের জীবনধারার সহিত কবির সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রাচীন ভারত দূরে ছিলনা ঃ কবির অন্তরে তার সামগান নিত্য ধ্বনিত হইত। প্রাচীন ধর্ম ও সমাজের সংস্কার আচার পদ্ধতি অনুষ্ঠান আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়া কবির দুঃখ ছিলনা ; প্রাচীন ভারতের শুদ্ধশান্ত জীবন-পরিবেশ নিবিড় জীবনবোধ ও উদার বিশ্বানুভূতি বিংশ শতাব্দীতে কবি ফিরিয়া পাইতে চান ঃ অতীত যুগের উদার মধুর সুন্দর শুচি জীবনবোধ সর্বানুভূতি রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে লাভ করিতে ব্যাকুল ; তার শান্তিনিকেতন আশ্রমের শান্ত পরিবেশে প্রাচীন ভারতের তপোবন জীবনের পুনর্প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি নিবিড় গভীর অনুভূতির ব্যাপার ; বর্ণবিচিত্র

ভাবমূর্তিতে ইহা কবির অন্তরে ছিল নিত্য উজ্জ্বল। অতীতের সহিত বর্তমান কালের ব্যবধান যতই বিপুল হউক না কেন কবির কল্পনায় ও অন্তরানুভূতিতে সুদূর ভারত মধুর আবেশ ও আকাঙ্খার সৃষ্টি করিয়া পরিচিত নিকট আত্মীয় হইয়াও পরম রহস্যময় হইযা উঠিয়াছে : দূরে থাকিয়াও অতীত কবিকল্পনায় তীব্র নিবিড় সকরুণ অনুভূতিতে নিত্য জাগ্রত। প্রাচীন যুগের সহিত বর্তমানের পার্থক্য ও কালের দূরত্ব থাকিলেও ভাবলোকের অসীম বিস্তারে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য : কবিকল্পনা অতীতের সহিত বর্তমানের অনুভূতির ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের সর্বানুভূতিতে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন অচ্ছেদ্য জীবনানুভূতির বিপুলরহস্যে পরস্পর গ্রথিত ; কবির বিশ্ববোধ দেশ ও কালের সকল বৈচিত্র্য ও ব্যবধানকে আবৃত করিয়া বিপুল আনন্দানুভূতিতে একাগ্র আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কথা কাব্যের কাহিনীগুলিতে অতীত ভারতের ত্যাগ ও সেবা বীরত্ব ও জাতীয়তা প্রেম ও মনুষ্যত্বের উদার মহৎ আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে : প্রাচীন নীরব ভারতবর্ষ কবির কাব্যে ভাষায় ছন্দে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শগুলিতে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত কোনো সংস্কার ও সংকীর্ণতা নাই ; এমনকি দেশগত ও কালগত কোনো বৈশিষ্ট্য কবিতাগুলিতে তীব্র হইয়া উঠে নাই ; আদর্শগুলি উদার উন্মুক্ত মনুষ্যত্বের প্রশস্ত ভিত্তিতে স্থাপিত ; ইহারা যেন বিশ্বের সমগ্র

মানবজাতির সাধারণ আকাঙ্খার ধন : বিশ্ব মানবসংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গিতে এমন একটি উদার মহিমা রহিয়াছে যাহাতে কবিতার বিচিত্র ভাব ও আদর্শগুলি বিশেষ কালের ও দেশের বলিয়া মনে হয়না ; ইহারা যেন সকল যুগের সকল মানুষের চিরন্তন আকুতি। নৈবেদ্যের কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ উদার অনুভূতিতে স্পন্দমান : অতীত যুগের আশ্রম-জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ প্রাণশিখা যাহা সেদিন ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনকে মধুরোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল তাহার অম্লান লাবণ্যটুকু কল্পনা দিয়া দূর হইতে অনুভব করিয়া কবি আধুনিক যুগের মানুষকে মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্নিহিত প্রাণধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন : তপোবনের নিভৃত নির্জন সহজ অনাড়ম্বর জীবনপরিবেশে মনুষ্যত্বের উদার ও নির্মল যে বিকাশ একদিন অতীতে ঘটিয়াছিল তাহা কল্পনা করিয়া কবি উল্লসিত ও আশ্বস্ত হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠান বিধিবিধান আঁকড়াইয়া ধরিবার আগ্রহ তার কাব্যে প্রকাশিত হয় নাই, অতীতের সাংস্কৃতিক ভাবজীবনের গৌরব অনুভব করিয়া কবি উদ্‌ভ্রান্ত উদ্‌ব্যস্ত আধুনিক যুগের জটিল জীবনপরিবেশে মানবসভ্যতার সংকটমুহূর্তে

বিশ্বশান্তি সৌভ্রাত্র ও মনুষ্যত্বের সাধনার নূতন পথনির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়সঙ্গীতে ও ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতি এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

*　　*　　*

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র অশোক মন্ত্র তব
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।

—**জাতীয় সঙ্গীত**

হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।

—**স্বদেশ**

যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে;

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবাধিত ধ্যান
পশিত আত্মীয় রূপে ! আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

—স্বদেশ

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

–স্বদেশ

সেইমতো ভারতের হৃদয় সমুদ্র এত কাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অন্তরে যা দিয়েছে ফিরে
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধ শিরে !
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে।

—সঞ্চিতবাণী

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু 'রিভাইবেলিজমের' যে আন্দোলন নবীন ভারতের শিক্ষিত হিন্দুসমাজে দেখা দিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাহা আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে সুস্পষ্ট মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ স্বামী প্রায় একই সময়ে নিজেদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগেব আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যের সাধনা কখনো স্বীকার করেন নাই : দৃশ্যে গন্ধে গানে সকল আনন্দ উপলব্ধি করিয়া কবি বন্ধনের ভিতর মুক্তির কামনা করিতেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোনো বাঁধাধরা মত পোষণ করিতেন না ; একটি উদার প্রশান্ত বন্ধনহীন প্রসন্ন অনুভূতি তার মানসলোকে নিত্য জাগ্রত থাকিত। প্রাচীন যুগেব সহিত আধুনিক যুগের অতীতের সহিত বর্তমানের দেশের সহিত দেশান্তরের বিশ্বের সহিত ব্যক্তির একটি সহজ সম্পর্ক অনুভব করিয়া কবি আনন্দিত হইয়াছেন ; বিশেষ কোনো সংকীর্ণ মতবাদের উপর তার বিশ্বানুভূতি ও মিলন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন : বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের এই তিনজন মনীষি ভাবতের তিনটি যুগের তিনটি সাধনাকে মূর্তি দান করিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ভারতকে বৈদিক সাধনায় আহ্বান

করিলেন ; সেই আহ্বানে লোকে হরিদ্বারের গুরুকুলে সমবেত হইল ঃ ১৯০২। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের উপনিষদের যুগকে ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া বিবেচনা করেন ; তিনি কালিদাসের বর্ণিত তপোবনের চিত্র মনোলোকে দেখিতে ছিলেন ; দেশবাসীকে তিনি সেই তপোবনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আহ্বান করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিচিত্র হিন্দু সংস্কৃতির সমাবেশ সাধনের জন্য মধ্যযুগের ভারত বা পৌরাণিক ভারতের আদর্শ প্রচার করিয়া মঠ স্থাপন করিলেন, নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন।* * * সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বিচিত্র ত্রিবিধ আন্দোলনকে বলা যায় ভারতের ইতিহাসের তিন যুগের সাধনা। একজন ভাবুক বেদের অপৌরুষেয়তাকে, দ্বিতীয় জন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে, তৃতীয় জন বেদান্ত ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া প্রচার করিলেন।* * হরিদ্বারের গুরুকুল, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বেলুড়ের মঠ গত ত্রিশ বৎসর নিজ নিজ সাধনা করিয়া আসিতেছে।—**রবীন্দ্রজীবনী ঃ প্রথম খণ্ড।** প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি আদর্শ প্রচার অপেক্ষা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস ছিল রবীন্দ্রনাথের বেশী ঃ তপোবন জীবনের শুদ্ধ শান্ত পরিবেশটিকে কবি আধুনিক যুগেও অনুভব করিতে চান ; মানসলোকে তিনি প্রাচীন ভারতের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে ব্যগ্র। প্রাচীন যুগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ; প্রাচীন আশ্রম-জীবনের মানস-সংস্কৃতি লাভের আকাঙ্খা

কবির ছিল ঃ উপনিষদের সর্বানুভূতির কামনা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার প্রশান্ত পটভূমিকায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি মানুষ ও সংস্কৃতির মধ্যে মিলন সাধন করিবার আগ্রহ কবিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের মানবমিলনের ও বিশ্বানুভূতির আদর্শ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পরিবেশে উপলব্ধি করিবার বাসনা কবির ছিল। প্রাচীন উপনিষদের যুগের উদার ঐক্যানুভূতি ও প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া এবং আধুনিক জগতের মানবতার আদর্শ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও কখনো সংকীর্ণ নির্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। আধুনিক বিশ্বে শান্তি ও মিলনের আদর্শ প্রচারিত হইলেও বার বার তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তবু বিশ্বযুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সংঘাত ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া মানুষ ঐক্য শান্তি ও মিলনের পথ আবিষ্কার করিয়াই চলিয়াছে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ ও আশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছে ঃ এই মহাপরীক্ষায় বিশ্বমানবতা যে জয়লাভ করিবে তাহাতে কবির সন্দেহ ছিল না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মেলা ও সঞ্জীবনী সভার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নব-পর্যায় পর্যন্ত আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি সজাগ নির্ভীক বলিষ্ঠ ছিল। তার কাব্যে ও প্রবন্ধে সমগ্র

সাহিত্যে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় জীবন বিকাশের প্রভাব পরিস্ফুট ; বিশেষ করিয়া তার জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতায় আধুনিক ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ও আত্মনির্ভরতার উপর ঝোঁক ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতায় উচ্ছ্বাস আবেগ ও উত্তেজনা কম ছিল। একটি সুদৃঢ় নির্ভীক উদার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি কবির দেশপ্রীতিকে জাতীয় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থকে আরব্ধ আমাদের জাতীয় আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর ও ব্যাপকতর হইয়া গণসংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিল ঃ প্রথমে ইহা শিক্ষিত সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিলেও ধীরে ধীরে ইহা কৃষক-মজুর ছাত্র-কেরাণী জণগণের ভিতর প্রসারিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের গানে কাব্যে প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-মেলার যুগের পরিণতি ঘটিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ; স্বদেশী যুগে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগ্রত ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অসহযোগ-আন্দোলন ও আইনঅমান্য আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা ও পরিধি বাড়াইয়া দিল ঃ জনসাধারণ মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে যদিও সরকারী বিভেদ নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ

দেখা দিল; ইহাতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঐক্য ও সংহতি দুর্বল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের ভিতরে যেমন জাতীয় জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল তেমনি ভারতের বাহিরে আন্তর্জাতিক জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটিতেছিল যাহা কবির জাগ্রত চেতনাকে নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছিল ঃ বুয়ার যুদ্ধ, রুশ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ, কবিব নোবেল পুবস্কার প্রাপ্তির পর বৎসরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, প্রাচীন চীনের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশে এবং পূর্ব ইউরোপে স্বাধীনতা লাভ ও নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ব্যপক ও তীব্র গণবিক্ষোভ। দেশের ভিতরে ও বাহিরে যেসব ঘটনা পরপর ঘটিয়া যাইতেছিল কিছুই কবিব সজাগ দৃষ্টি এড়ায় নাই। বিশ্ব-মানবের বিচিত্র জীবন সমস্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনো উদাসীন ছিলেন না; তার গভীব মানবতাবোধ আধুনিক যুগেব মানবজাতির গভীব ও জটিল সমস্যা সম্পর্কে কবিকে সজাগ ও ভাবাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বশান্তি ও মানবমিলনের আদর্শ ও উদার মানবতাবোধেব সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভ্রান্ত বিশ্বের আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানেব নির্দেশ দিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণকামনায় রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভুলেন নাই। মানবসমাজের মঙ্গল কামনায় ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির শুভেচ্ছাও

অন্তর্নিহিত ছিল। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : মনোরাজ্যে তিনি আন্তর্জাতিক কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তিনি পরিপূর্ণ স্বাদেশিক।—**রবীন্দ্র জীবনী : দ্বিতীয় খণ্ড**। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যে উৎকট স্বাদেশিকতার ভাব দেখা গিযাছিল তাহা সমর্থন করেন নাই ; তিনি বলিলেন : আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে, কিন্তু বিলাতের নেশন নহে।—**বঙ্গদর্শন**। কবি এই স্বাদেশিকতাকে মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি বলিয়া মনে করেন নাই। মনুষ্যত্বকে ন্যাশলিজমের উপরে তিনি স্থান দিয়াছিলেন ; যে স্বাদেশিকতা বিশ্ব ও বিশ্বমানবকে অস্বীকার ও অপমান করে সেই দেশপ্রীতিকে কবি শ্রদ্ধা করেন নাই। জাতীয় আন্দোলনকে একটি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট গঠনমূলক কর্মধারায় নিয়ন্ত্রিত কবিবার দাবী রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করেন স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে : ১৯০৪। আর জাতীয় এই কর্মকেন্দ্র হইবে ভারতের পল্লীগ্রাম। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের মর্মস্থান হইল তাহার গ্রাম। এই গ্রামের সমস্যা ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা ; গ্রামে নূতন প্রাণ জাগাইতে পারিলেই দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে। বিশ্বের মিলনকামী কবি হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিরোধ ও বিভেদ দেখিয়া মর্মাহত ও শংকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই বিরোধ ও বিদ্বেষ ক্রমশ বাড়াইয়া তুলিবার জন্য বিদেশী শাসককে অভিযুক্ত করেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে কবি চিরকাল তীব্র কঠোর হইয়া উঠিতেন। যাহা কবির

বিশ্বমানবতাবোধ ও মিলন আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া মনে হইত রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষায় ইহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কবিদের মতো রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মেলার যুগে রচিত জাতীয় সঙ্গীতে অতীত ভারতের শক্তি ও গৌরব সম্পর্কে সচেতন হইয়া বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন: একটা বেদনার সুর এই সময়কার গানে ও কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত মহিমা স্মরণ করিয়া কবি গৌরব বোধ করিলেও তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করিতেছেন: দুঃখ ও নৈরাশ্যে মর্মাহত হইলেও তরুণ দেশপ্রেমিক জাতীয় আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের ভাবী কল্যাণ কামনা করিয়া আশ্বস্ত ও আশঙ্কিত হইতেছেন। তবু একটা ব্যথার তীব্র অনুভূতি এই জাতীয় সঙ্গীতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। জাতীয় জীবনে আত্মশক্তি ও বিশ্বাস তখনো সুদৃঢ়ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

যেদিন তোমার গিয়াছে চলিয়া সেদিন তো আর আসিবেনা,
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া সে আর পূরবে উঠিবেনা।

* * * *

ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব বিজনে বিষাদে বীণা ঝংকারিব
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই তখন ভারত কাঁদিবে।

—**জাতীয় সঙ্গীত**

অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখী, গা লো, সেই সব পুরানো গান,
বহু দিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দেনা লো আঁধার প্রাণ।
হারে হতবিধি মনে পড়ে তোর সেই এক দিন ছিল,
আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল।

—জাতীয় সঙ্গীত

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।

—জাতীয় সঙ্গীত

বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘিরিলে দশদিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।

—জাতীয় সঙ্গীত

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম্।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দে মাতরম্।

—জাতীয় সঙ্গীত

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনী সরকার যখন বাংলা ভাগ করিবার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে তখনই সারাদেশে উত্তেজনা দেখা দেয়! রাজনৈতিক আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশকে আন্দোলিত করিতে থাকে; বাংলার এই দুর্ভাগ্যকে ভারতবর্ষ সমগ্র জাতির উপর উৎপীড়ন বলিয়া গ্রহণ করে। বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিবার আয়োজন হইল; বাংলাদেশে দেশীয় শিল্প ও চিত্রের নব জাগরণ দেখা দিল; রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও অবনীন্দ্র ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ভারতীয় আর্টের নবজন্ম হইল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করিলেন। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫, যখন বঙ্গচ্ছেদ হইল তখন শিক্ষিত বাংলার দুর্দম বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের দিনকে রাখি-তৃতীয়া বলিয়া পালন করিতে বাঙালীকে আহ্বান করিলেন ঃ কবি রাখিসঙ্গীত রচনা করিলেন ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, হে ভগবান।

* * *

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হোক এক হোক এক হোক, হে ভগবান।

—স্বদেশ

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই স্বপ্নদেখার সময় তো নাই,
ওরা যতই গর্জাবে ভাই তন্দ্রা তত ছুটবে।
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।

—স্বদেশ

প্রধানত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আবর্তিত হইলেও স্বদেশীযুগে জাতীয় আন্দোলনে তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা কম ছিল না। তবে আবেগ উচ্ছ্বাস যে পরিমাণ ইহাতে প্রকাশ পায় সে পরিমাণ সুস্পষ্ট কর্মোদ্দম ইহাতে ছিল না। তাহা ছাড়া এই আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনার সহিত প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মোপলব্ধি ও অনুষ্ঠান জড়িত হইয়া ছিল। বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া সেদিন দেশবিভাগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুমেলার যুগের জাতীয় গীতিতে নৈরাশ্যের যে সকরুণ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল স্বদেশী যুগের গানে তাহা নাই ঃ বরং এই যুগের জাতীয় সঙ্গীতে একটি বলিষ্ঠ বেগবান আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই ; জাতীয় অপমান ও অসম্মানের বিরুদ্ধে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার নির্ভীক সাহস ও সংগঠন শক্তি বাংলার শিক্ষিত সমাজকে সেদিন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের দেশপ্রেমের সঙ্গীতে জাগ্রত বাংলার আত্মবিশ্বাসী বলিষ্ঠ চেতনার অভিব্যক্তি ঘটিল। বিলুপ্ত অতীতের দিকে তাকাইয়া নিস্ফল অশ্রুবর্ষণ করিবার সময় ও শক্তির অপচয় করিবার অবকাশ বাঙালীর ছিল না; প্রাচীন ভারতের প্রতি মোহ ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও অব্যবহিত বর্ত্তমানের জীবন্ত সমস্যাগুলি এমন তীব্র ও প্রচণ্ড হইয়া দেখা দিল যে স্বপ্ন দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও অবকাশ আর বাঙ্গালীর রহিল না। জাতীয় চেতনায় বাংলার সহরগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের গানগুলিতে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের আশা আকাঙ্খার বিশেষ রূপটি ধরা দিয়াছে ঃ যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গানগুলি রচিত তাহা প্রধানত বাঙালী ও বাংলার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দিয়াছিল। হিন্দুমেলার যুগের গানে কবি সমগ্র ভারতের বেদনা ও আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন; স্বদেশী যুগের জাতীয় সঙ্গীত বিচ্ছিন্ন বাংলার রক্তাক্ত হৃদয়নিঃসৃত প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিবার সুদৃঢ় কামনার আত্মপ্রকাশ। এই গানগুলিতে কবি বাঙালীর ঐক্য ও মিলনের বাণী প্রচার করিয়াছেন ঃ দেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করিবার জন্য রাজরোষ উদ্যত হইয়া ছিল।

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।

*   *   *

ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে মুখ দেখাবি কেমন করে,
ওরে দে খুলে দে পাল তুলেদে যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

—**স্বদেশ**

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা
বলোরে।
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা, ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।

—**স্বদেশ**

আগের যুগের স্বদেশী গানে প্রেরণার চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদ ছিল বেশী; সাহিত্যিক মূল্য ও শিল্পিক সৌন্দর্য কিছু থাকিলেও গানগুলিতে অনুভূতির তীব্রতা ও ভাবের গভীরতা কম; এই গুলি আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে প্রচলিত বাংলা কাব্যের জাতীয় সঙ্গীতের ধারায় রচিত; যদিও রচনায় কবির স্বকীয়

শিল্পভঙ্গির ছাপ রহিয়াছে, তবু সেযুগের স্বদেশী গান বেদনায় অবসন্ন প্রাচীন ভারতের গৌরব-গরিমার অনুভূতিতে পাণ্ডুর সকরুণ। "কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় রচিত গানগুলির অধিকাংশই একটি তীব্র আবেগের প্রেরণায় উৎসারিত। এই সব গানের ভিতর দিয়া কবি দেশকে কেবল দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করিলেন না, দেশবাসীর অন্তরে ভাবের জোয়ার বহাইলেন ও শক্তির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিলেন। ভাবের স্রোতে সাহিত্য নূতন রূপ লইল, শক্তির উদ্বোধনে জাতি নূতন প্রাণ পাইল"।
—রবীন্দ্র-জীবনী : দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বদেশী যুগের গানগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে গানগুলি প্রধানত বাউল সুরে বাঁধা। বাউলসুর বাংলার নিজস্ব সুর ; লোকসঙ্গীত বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি সারিগানের সুর বাংলার অন্তরনিঃসৃত সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত প্রবাহ। এই সুরগুলি সোজা ও সহজে আমাদের মনে অনুরনন জাগাইয়া দেয়, মর্মকে স্পর্শ করে। সাধারণ লোকের কাছে ইহাদের বাণী আপনি পৌঁছে। যে সমস্যা ছিল সমগ্র দেশের যে বেদনা ছিল সারা বাংলার তার প্রকাশ হইল বাংলাদেশের আপন সুরে লোকগীতিতে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি বিক্ষুব্ধ বাঙালীর শিক্ষিত জাগ্রত মনের বেদনা ও অভিপ্রায়কে আপন ভাবে অনুভূতিতে ছন্দে সুরে ব্যক্ত করিয়াছে ; ভাবে ও সুরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে এইগুলি ছিল তখন আমাদের

দেশপ্রীতির গান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বাংলার সৌন্দর্য-বর্ণনা করিয়াছে: 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,' 'আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'; কয়েকটি গান দেশকে বন্দনা করিয়াছে: 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' কিন্তু অধিকাংশ স্বদেশী গান তেজোদৃপ্ত সংগীত: ইহারা যেন বাঙালীকে জাতীয় সংগ্রামের কঠোর শক্তিপরীক্ষায় আহবান করে।

বিভক্ত বাংলা আবার মিলিত হইলেও ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ক্রমশ ব্যাপকতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। স্বদেশী যুগ হইতেই ভারতের রাজনীতিতে চরম ও নরম পন্থী, বাম ও দক্ষিণ পন্থীর আবির্ভাব দেখা গেল। নরমপন্থীরা আবেদন নিবেদনের মারফৎ আইন ও শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতের স্বায়ত্বশাসন লাভের কামনা করিতেন; রুদ্রপন্থীরা মনোবল ও বাহুবলের সাহায্যে দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন দেখিতেন: বিদেশী শাসকের সহিত কোনো আপোশ চলিতে পারে না। চরমপন্থীরা বুলেট ও বোমা ফাটাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উৎখাত করিতে অগ্রসর হইলেন: বাংলায় ও ভারতে সন্ত্রাসবাদ সুরু হইল। রবীন্দ্রনাথ কোনো দলের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি দেশের সার্বজনীন ব্যাপক

সমস্যাগুলি ও ইহাদের স্থায়ী সমাধানের দিকে দেশবাসীর মনকে আকর্ষণ করিতে চাহিলেন : ঐক্য ও মিলনের বাণী প্রচার করিয়া কবি বিভিন্ন দল ও মতের ভিতর সংহতি সাধন করিয়া জাতীয় জীবনের সাধারণ ও সার্বজনীন দৈন্য ও অভাব মোচন করিতে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিলেন। ১৯০৭, সুরাট কংগ্রেসের পর লিখিত 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেনঃ মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্ত ভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যিকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন দেশের শিক্ষাস্বাস্থ্যে অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশের সত্যিকার সাধনা ও সত্যিকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।

কবি যে শুধু ভারতের প্রাচীন মিলনের আদর্শে দেশকে জাগ্রত করিতে চাহিলেন তাহা নহে, তিনি প্রাচীন ভারতের সৃষ্টিপ্রতিভাকেও আধুনিক রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্ত করিতে

চাহিলেন। সেইজন্য তিনি গঠনমূলক কাজের সুনির্দ্দিষ্ট পরিসরে জাতীয় মুক্তিসাধনার সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। কাব্য ও কল্পনায় নিবিড়ভাবে লিরিক ও রোমান্টিক ছিলেন বলিয়াই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ কর্মে ছিলেন কঠোর বস্তুনিষ্ঠ। কবি কোন রাজনৈতিক দলে আপনাকে জড়াইয়া ফেলেন নাই, তবু দেশের প্রগতিশীল ভাবধারা ও কর্মপ্রয়াসের সহিত তাহার চিরকাল সহমর্মিতা ও সহযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা—সংগ্রাম ক্রমশ জটিল ও তীব্র হইয়া উঠে: অহিংস অসহযোগ আন্দোলন রূপান্তরিত হইল আইনঅমান্য আন্দোলনে; ইহার সঙ্গে চলিতেছিল রুদ্র রাজনৈতিক দলের সর্বত্যাগী নির্মম সন্ত্রাস। ব্রিটিশ সরকারও একই সঙ্গে দুই পরস্পরবিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়াছিল: একদিকে চালাইল হিংস্র নৃশংস বর্বর অত্যাচার, অন্যদিকে দিল শাসন সংস্কার করিয়া ভারতবাসীকে নামমাত্র আত্মাধিকার: একদিকে চলিল জেল ফাঁসি বোমাবুলেট জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, সঙ্গে আসিল মর্লিমিণ্টো শাসনসংস্কার, মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-ব্যবস্থা ও ভারতশাসন আইন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বৈত শাসননীতিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না: তার বিশ্বাস ও ভরসা ছিল আত্মশক্তি ও জাতীয় জীবনের সংহতি ও সংগঠনে। নোবেল পুরস্কার পাইবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ জটিল

রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া গেলেন; কিন্তু ভারতে মুক্তিসংগ্রামের সহিত কবির যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হইল না। তার ব্যগ্র আকুল দৃষ্টি সংগ্রামী আত্মত্যাগী তরুণ ভারতের উপর নিত্য আশীর্বাদ বর্ষণ করিত। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করেন নাই, কারণ এই আন্দোলনের মর্মগত নীতি ছিল বিরোধ ও অসহযোগ। এই নীতি কবির জীবনদর্শনের মূল আদর্শ মিলন ও সহযোগিতার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' তাহাদের দুর্জয় সাহস ও দুর্বার গতিবেগ রোমান্টিক কবিকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে। সত্য অহিংসা ও শান্তির সাধক হইলেও মৃত্যুঞ্জয়ী দুর্দান্ত দেশপ্রেমিক তরুণদের অগ্নিময় জীবনের রুদ্র বহ্নিজ্বালা কবির রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্বেল করিয়াছে। বাংলার নির্ভীক তরুণ প্রাণের স্বাধীনতার স্বপ্নকে রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। তরুণ ভারতের বন্ধনহীন দুর্দম যে মুক্তি-অভিসার মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আগুনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল কবি তার অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা একাগ্রতা ও ভয়লেশশূন্য আত্মাহুতির অবিচল আকাঙ্খা দেখিয়া উল্লসিত ও গর্বিত হইয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দেশপ্রেম যারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের কখনো ক্ষমা করেন নাই। ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর বর্বরতা যখন

জালিয়ানওয়ালাবাগে ফাটিয়া পড়িল কবি তখন এই পাশবিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। যখনই যে কেহ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিদ্রূপ করিয়াছে তখনই কবি তার কঠোর সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো সাম্রাজ্যবাদ—ইংলণ্ডের হোক বা জাপানের হোক—সমর্থন করেন নাই। তার বিশ্বমৈত্রী শান্তি ও স্বাধীনতার আদর্শের পরিপন্থী ছিল বলিয়া কোনো জাতির সাম্রাজ্যলোভ কবি কখনো কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন নাই। রাজনৈতিক যুক্তি দিয়া কবি ইহার বিচার করিতেন না, তার মানবতার মিলনের আদর্শ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ অসঙ্গত বলিয়া অস্বীকার করে।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সর্বব্যাপী প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। শান্তিনিকেতনের নিভৃত আম্রকুঞ্জে ও শালবীথিকায় কবির শান্ত আত্মসমাহিত সাহিত্যিক জীবন অতিবাহিত হইলেও স্বদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যবিবর্তনের উপর কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর আগ্রহ ছিল। বাংলাদেশের সমসাময়িক গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশ সমাজপতি, কাব্যবিশারদের ব্যঙ্গ রচনায় ব্যক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে রক্তাক্ত করিলেও কবির সর্বাঙ্গীন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

ব্যাপারে সাহিত্য ও শিল্পে রবীন্দ্রনাথেরও সংস্কার ও গোঁড়ামি অল্পবিস্তর ছিল ; তবু আজীবন তার একটি বলিষ্ঠ আত্মসচেতন কল্পনাসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে সর্বব্যাপারে গতিশীল অগ্রণী ও অনুসন্ধিৎসু করিয়া রাখিয়াছে। কবির যাত্রাপথের শেষ নাইঃ তিনি অশ্রান্ত পথিক ; দিগন্তে বিলীন বলাকার মতো তার নিত্য অভিসার মানসলোকের অদৃশ্য সরণীতে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কোথাও থামে নাই ; বিচিত্র অনুভূতির রঙে রসে আপনাকে চারিদিকে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছেঃ 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে, আঘাত হয়ে এলো এবার আগুন হয়ে জ্বলবে।' কবি বলেনঃ আমার পথ চলাতেই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মনের ইহা চিরযাত্রার সঙ্গীত। আমাদের জাতীয় আন্দোলন বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া যতই জনগণের ভিতর বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, কবির জাতীয় সঙ্গীতগুলিও ততই ব্যাপকতর অনুভূতি ও কল্পনাকে আশ্রয় করিতে থাকে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে জনগণ যতই অগ্রসর হইয়া আসিল রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ততই প্রসার লাভ করিয়া একটি সার্বজনীন বৈপ্লবিক শক্তি ও সুষমা লাভ করিল। দেশের সাধারণ অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষ কৃষকমজুর ছাত্র কেরাণী শিক্ষক গোমস্তা, সমগ্র দেশ যখন শতাব্দীসঞ্চিত জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার বন্দীশালা হইতে মিছিল করিয়া বাহির হইতে

লাগিল কবি তখন এই বিরাট জনজাগরণের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত ও উল্লসিত হইলেন। জাতীয় সঙ্গীতে কবি আরো বেশী বাস্তবনিষ্ঠ হইলেন: তার মিষ্টিক কল্পনা শক্ত মাটির বুকে রসের সন্ধান করিল; রোমান্টিক পরিবেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশের মাঠেময়দানে ঘাটেবাটে জীবন্ত জাগ্রত দুস্থ দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিল। মিষ্টিক ও রোমান্টিক কল্পনার রঙীন ও রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ছায়ার মতো চিরকাল রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়াছে। তবু জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক হওয়ার সঙ্গে তার দেশপ্রেমের কবিতায় ও গানে একটি সবল সহজ বাস্তবনিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেল। কবির সামাজিক শ্রেণীগত সংকীর্ণ মনোভাব ও আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িল। হিন্দুমেলার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত রচিত স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা ও সহানুভূতির ক্রম-বিস্তার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর মোহ ও মায়া থাকিলেও কবিমন খুব সচল ও সক্রিয় ছিল বলিয়া তীব্র গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারের কারায় আপনার মানসলোককে বন্দী করিয়া কবি রাখেন নাই: আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের নূতন পরিবেশে মানবজীবনের বিচিত্র ও নূতনতর অভিব্যক্তির মৌলিক দাবী ও প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার

করেন নাই, যদিও পুরাতনের সঙ্গে নূতন আদর্শের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবনধারার মিলন কামনাও তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে করিতেন। কবির কাব্যে ও মানস-সংস্কৃতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা যতই প্রখর ও গভীর হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের বিচিত্র ও চঞ্চল পরিবেশের প্রভাব কখনো এড়াইতে পারেন নাই, তাহা কামনাও করেন নাই; যদিও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল বিভেদ ও বিরোধ—কণ্টকিত হওয়ার সঙ্গে তিনি ক্রমশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির শান্ত মধুর পরিবেষ্টনীর অন্তরালে আশ্রয় নিয়াছিলেন। স্বরাজলাভের উপায় যে আত্মবিশ্বাস জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও গঠনমূলক সমাজসেবা তাহা রবীন্দ্রনাথ বরাবর স্বীকার করিতেন। ভিক্ষা দ্বারা মহত্ব অর্জন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম সম্পূর্ণরূপে কোনোকালেই রাজনৈতিক ছিলনা ঃ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাবনা ইহাকে কখনো ধূলিধূসর কূটনীতির সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের বেড়াজালে সমাচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের গণচেতনা ছিল। কিন্তু শ্রেণীগত জীবন ধারার অনিবার্য পরিস্থিতিতে সে চেতনা বহুবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গেলেও কবি জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌছিয়া আধুনিক বিশ্বে জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া আপন কাব্যশিল্পের সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের ব্যর্থতার জন্য আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এই স্বীকারোক্তি শুধু ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের একারই

নয় ; ইহাতে আধুনিক যুগের সকল রোমান্টিক কবির স্বাক্ষর মিলিবে। বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিদের অনাদৃত শোষিত জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকিলেও তাহাদের কাব্যশিল্প বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ করিয়াও সর্বত্রগামী হয় নাই : ভদ্রসমাজের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া সংকীর্ণ বাতায়নের ভিতর দিয়া তাঁতি ও জেলের বহুপ্রসাবিত বিচিত্র কর্মভার ও জীবনযাত্রা তারা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু অস্পৃশ্যপাড়ার অনাদৃত প্রাঙ্গনের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিবার শক্তি তাহাদের ছিলনা। রোমান্টিক কাব্যশিল্পের নকল শৌখীন মজদুরী আপন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীতে অবরুদ্ধ থাকিয়া কথা ও আঙ্গিকের নূতন ভঙ্গিতে চোখ ও মন ভুলাইলেও ইহা অখ্যাত জনগণের অবজ্ঞাত মনের নির্বাক মর্মবেদনা উৎসারিত করিয়া তাহাদের আন্তরিক আত্মীয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগেব নাগরিক কাব্য পল্লীর কৃষাণের উপেক্ষিত জীবনের শরিক হইতে পারিল না। জাতি বর্ণ ও শ্রেণীগত অনিবার্য সংস্কার অতি উদার ও মানবতাবোধে সমৃদ্ধ কবিমনকেও কতকটা সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ আপন কাব্যের এই ত্রুটি, সুরের এই অপূর্ণতার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এই স্বীকারোক্তি তার দেশপ্রেমকে মূঢ় ম্লান মূক দরিদ্র দেশবাসীর প্রাণহীন আলোহীন অন্নহীন জীবন প্রাঙ্গনের আর্তনাদের মাঝখানে

আনিয়া মুক্ত সার্বজনীন করিয়া দিয়াছে। নজরুলের কাব্য যতখানি মাটির কাছাকাছি আসিয়া মজুরের ভগ্ন দরিদ্র অপমানিত জীবনের শরিক হইতে পারিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ততখানি জনসাধারণের জীবনকে আপন করিতে পারে নাই। ইহার কারণ দুই কবির জীবনদর্শনের মৌলিক পার্থক্য : বিচিত্র জীবনের অন্তর্মূলে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক এক মহা সমন্বয় ও বিশ্বমিলনের মিষ্টিক কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পরস্পরবিরোধী ও বিদ্যমান ভাব ও আদর্শের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিতেন ; বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য তো কবি দেখিতে পাইতেনই, বিরোধের মধ্যেও তিনি মিলন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু নজরুলের বিপ্লবী মনোভাব বিরোধ ও অসঙ্গতির ভিতর আপোশের কামনা করে নাই : পরস্পর বিরোধী শক্তির একটিকে উৎখাত করিয়া ধ্বংস করিয়া আপনার জীবনাদর্শের জয় কামনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মূল বিশ্বাস ছিল আপোশের মিলনের, কিন্তু নজরুলের লক্ষ্য ছিল দুশমনের সহিত আপোশহীন লড়াই : সর্বাঙ্গীন সংগ্রাম। দৈনিক জীবনের বাস্তব পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে যে সংগ্রাম চলিতেছে মানব সমাজেও তার অনিবার্যতাকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অস্বীকার করেন নাই, তবে অদৃশ্য আধ্যাত্মিক ভাবলোকের মিষ্টিক অনুভূতি তার সদা জাগ্রত ছিল বলিয়া বহির্লোকের বিরোধ কবির মনোলোকে মিলনের আনন্দে

আপন তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতা হারাইয়া মসৃণ ও মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। নজরুলের কাব্য ও জীবন কোনো দার্শনিক তত্ত্বের পূর্বকল্পিত বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। স্বদেশীসঙ্গীতে নজরুল যতখানি বিপ্লবী ও বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ততখানি ছিলেন না। বাস্তব জীবনের কঠিন কঠোর সমস্যা ও সংগ্রাম দুর্গম বন্ধুর পথযাত্রার রুক্ষ রূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনায় মেদুর মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা দিয়া জীবনকে সুন্দর মধুর করিয়া তুলিয়াছেন; নজরুল জীবন দিয়া কল্পনাকে মথিত মন্দ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্ব দিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন : নজরুল জীবন মথিত করিয়া জীবনের বিষ ও অমৃত আহরণ করিয়াছেন। নজরুলের পরিবেশ প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা তাহাকে ধূলিম্লান কর্মমুখর রাজপথে সংগ্রামী সাধারণ মানুষের ভিড়ে টানিয়া আনিয়াছে। সর্বহারা মানুষেব প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল ব্যাপক হইয়াও নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক; অজ্ঞ সাধারণ শোষিত মানুষের সহিত নজরুলের ব্যবধান ছিল কম, আত্মীয়তা ছিল ঘনিষ্ঠ, পরিচয় ছিল ব্যক্তিগত ও বাস্তব। শান্তিনিকেতনের নিভৃত আশ্রমের সুদূর লতাবিতানে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ মানস-লোকে মহামানবের জয়যাত্রা লক্ষ্য করিয়াছেন; কবি নজরুল কলিকাতার বাংলার পথেঘাটে অলিতে গলিতে দুর্ভাগা দুস্থ ক্ষুধিত মানুষের ভিড়ে বিপ্লবের সারিগান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন।

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—

* * * *

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

* * * *

কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

* * * *

অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

* * * *

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে

তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে।

—এবার ফিরাও মোরে ঃ ১৩০০

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

* * * *

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

—**অপমানিত ঃ ১৩১৭**

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুক্ষণে ধরিত্রীর মহা—একতান
কতনা নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।

সব চেয়ে দুর্গম যে—মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারিপরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
নাহলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা আমি জানি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

—ঐকতান : ১৯৪

ইউরোপীয় বণিকগণের ভারত আগমনে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা এবং ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব ও শাসনের ক্রমপ্রবর্তনের অনিবার্য ফলে এই সম্পর্ক মধুর না হইলেও দৃঢ় হইল। এই পরিচয় ব্যবহারিক জীবনেব প্রাত্যহিক কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষিত ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আদর্শ ও কর্মধারা ইহার প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত পরিমার্জিত ও প্রসারিত হইল। ঘরে বাহিরে কর্মে চিন্তায় সমগ্র ভারতব্যাপী এক ভাব-বিপ্লব সকল দিকে প্রবল দুর্নিবার গতিতে আবির্ভূত হইয়া পুরাতনকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই বিপুল উন্মত্ত নবজাগরণের আন্দোলন ভুলত্রুটি বিভ্রমবিচ্যুতির অন্তরালে ভারতীয় সৃষ্টিপ্রতিভা সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের একটি পথ আবিষ্কার করিতেছিল। কিন্তু নব ভারতের বিদ্রোহী রাষ্ট্রচেতনা অন্যায় অত্যাচার শোষণ ও পরাধীনতার সহিত কখনো আপোশ করে নাই। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র বলিষ্ঠ সৃষ্টিশক্তি ম্লান ও মৃতপ্রায় হইয়া গেলেও বিলুপ্ত হয় নাই: ইউরোপের নূতন বেগবান ভাবাদর্শের সংঘাতে ইহা তড়িৎ স্পর্শের মতো চমকিয়া উঠিয়া দিকে দিকে আত্মাভিব্যক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযানে যাত্রা করিল। আধুনিক যুগে আমাদের শিল্প-সাহিত্য সমাজরাষ্ট্র শিক্ষাসংস্কৃতি বিভিন্ন বিচিত্র

চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে সে-জয়যাত্রা তার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এক সর্বাঙ্গীন বিকাশের উন্মুক্ত প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদগ্র হইয়া দেখা দিয়াছিল : এক বিপুল কর্মোদ্যম ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে দিশাহারা কবিয়া তুলিয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন আদর্শের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংঘাতে ভারতবাসীর জীবনে এক নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অবশ্য প্রধানত এই ভাববিপ্লব সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ সীমানায় আন্দোলিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতার কর্মোন্মাদনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আত্মবিস্মৃতির তন্দ্রাজড়িমা বিদীর্ণ করিয়া ভারতের সৃষ্টিপ্রতিভা মুক্ত করিয়া দিল : আধুনিক যুগের নবজাগ্রত ভারতবর্ষ রাজপথের চঞ্চল জনস্রোতে আসিয়া নিখিল বিশ্বের সহিত একটি নূতন ভাবসম্পর্ক আবিষ্কার করিতে চাহিল। এই সচেতন প্রয়াসে শিক্ষিত মন আত্মপর দেশবিদেশ ব্যক্তিবিশ্ব অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রাত্যহিক সমস্যা ও চিরন্তনের কল্পনার প্রতি জাগ্রত হইয়া জীবন ও জগতের মধ্যে এক নূতন সঙ্গতি ও সমন্বয় খুঁজিতে লাগিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভ কাল হইতেই দেখা যায় ভারতবাসী শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই নয়, ঐহিক ও পার্থিব ব্যাপারেও অতিশয় আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক মানুষের চিন্তা ও আদর্শ আধ্যাত্মিক সমস্যা অপেক্ষা

ঐহিক বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অধিক আন্দোলিত হইতে লাগিল : নব যুগের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় সামাজিক অর্থ-নৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থা লইয়া বিব্রত হইল, সাহিত্যেশিল্পে নূতন রূপসাধনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতকের ধর্ম-আন্দোলন সামাজিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে অভিব্যক্ত হইল। ঐহিক জীবনের প্রতি অনুরাগ ও কৌতূহল—মধ্যযুগের প্রতিকূল পরিবেশে যাহা স্তব্ধ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল—আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনপরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাইয়া দিল : বিগত যুগের জীবন-বিমুখীনতাব প্রতিবাদ দিকে দিকে জাগ্রত হইল। বাস্তব জীবনের কঠিন কঠোর সমস্যার প্রতি বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী আর উদাসীন থাকিতে পারিলনা : প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনের জ্বলন্ত জীবন্ত সমস্যাগুলি তাহাদের প্রবলভাবে সজাগ ও ইহাদের প্রতিকারের ভাবনায় অবিরাম ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অদৃশ্যলোকের অনাবিষ্কৃত রহস্যের পশ্চাতে কল্পনাকে উধাও করিয়া দিবার আগ্রহ একেবারে দূর হইল না বটে, তবু আধুনিক যুগের দৃষ্টি নামিয়া আসিল স্বর্গ হইতে মর্ত্যে, দেবতারা পদচ্যুত হইলেন এবং শূন্য দেউলে যে নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল সে মর্ত্যের মাটির প্রত্যক্ষ মানুষ।

সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা সখ্য-বিরোধ জন্ম-মৃত্যু দ্বারা বিচিত্রিত

নিয়ত প্রবহমান পরিবর্তনশীল জীবনের মহিমা ও গ্লানি আধুনিক সাহিত্য স্বীকার করিয়াছে। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া কবিকল্পনা নূতন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বেল হইয়াছে। আধুনিক যুগের সাহিত্য জীবন-স্বীকৃতির সাহিত্য। আধুনিক যুগের আদি কালের কবি ঈশ্বরগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল কবির শিল্পরচনার প্রেরণা জীবনবতি ঃ আধুনিক সাহিত্যের ভাববস্তু জীবন ও জগৎ। আধুনিক কবি মানব ও মর্ত্যজীবনকে উপেক্ষা করে নাই ঃ ইহার সৌন্দর্য ও বীভৎসতা মহত্ব ও হীনতা ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য প্রাচুর্য ও রিক্ততা তাহাকে বিক্ষুব্ধ বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর বাহিরের রহস্য ও সৌন্দর্য ও আধুনিক কবিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের জীবনই আধুনিক শিল্পীমনকে বেশী আলোড়িত করিয়াছে ঃ আধুনিক সাহিত্য মানবজীবনের আনন্দবেদনায় বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিকল্পনা তার বিশ্বপ্রীতি ও মানবতাকে মিষ্টিক ভাবদ্যুতিতে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথও জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উল্লসিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ একদিকে বস্তুবিশ্বের রূপ-রস-সমৃদ্ধ হইয়া মানুষের বিচিত্র জীবন প্রকাশে কৌতুহল ও আগ্রহে চিরচঞ্চল, অন্যদিকে অসীম ভাবলোকের অনন্তবিস্তার আকাশপারে ইন্দ্রধনুর

বর্ণসমারোহ দিয়া মর্ত্য-জীবনকে নিঙড়াইয়া তুলিতে ব্যগ্র। কল্পনা দিয়া কবি জানা-অজানা দ্যুলোক-ভূলোকের ভিতর মিলন-সেতু স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের গাঁথা প্রেম-উপহারের মতো রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতির গান ও 'চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার বৈকুণ্ঠের পথে।'

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

—**বৈষ্ণব কবিতা**

মানবতাবোধনিবিড় আধুনিক বাংলা কাব্য নারী-অর্চনায় মধুর ও মোলায়েম হইয়া আছে। আধুনিক বাঙালী কবি নারীর সামাজিক দুঃখ ও দুর্গতি দেখিয়া ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া অন্তরের অকৃত্রিম সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়াছে ; নারীর দেহের রূপসুষমা ও হৃদয়ের প্রেম পুরুষ কবির কল্পনাকে মুগ্ধ ও দুরন্ত করিয়াছে।

আধুনিক যুগে আমাদের দেশে নর-নারীর বিকৃত সম্পর্কের জড়তা ও অস্বাভাবিকতা কিছুটা কাটিয়া যাওয়াতে শিক্ষিত বাঙালী সহজভাবে মেয়েদের মুখের দিকে চাহিতে পারিয়াছে। নারীকে ভারতবর্ষ কখনো দেবতা-রূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিয়া মাথায় তুলিয়াছে, কখনো পুরুষের দাসী-রূপে ভাবিয়া সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছে। এই দুই মনোভাবের কোনোটাই সুস্থ বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচায়ক নয়। আধুনিক রোমান্টিক কবিরা কল্পনার মাধুর্য ও সৌন্দর্য দিয়া রক্ত-মাংসের বাস্তব নারী-জীবনকে ভাবানুভূতির জ্যোৎস্নাধারায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। মুগ্ধ কবির দৃষ্টিতে নারীর বাস্তব রূপ কল্পনায় মধুর মোলায়েম হইয়া উঠে। প্রতিদিনের পরিচিত নারী ভাবানুভূতির উষ্ণ স্পর্শে কল্পলোকের উর্বশী হইয়া দেখা দেয়। নারী শুধু মানবী নয়, সে মানসীও।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। * * * *
লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পরেছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা। —মানসী

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে পুরুষের সহিত নারীর সাম্য ও সমানাধিকার দাবী করিয়াছেন : পুরুষ ও নারী বন্ধুত্বের সমপর্যায়ে আসিলেই পৌরুষ ও নারীত্ব সার্থক হইয়া উঠে। চিত্রাঙ্গদা দেবী হইতেও চায় না ; দাসী হইতেও তার উৎসাহ নাই। সে চায় অর্জুনের সহচরী হইতে : সুখে-দুঃখে সংকটের পথে তার চিন্তার সমভাগী হইতে।

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখেদুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমাব পাইবে তবে পরিচয়।

—চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা এখানেও থামিয়া যায় নাই। তিনি নারীকে আপনার স্বাধীন মুক্ত শক্তি ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভিক্ষা চাহিয়া পরপ্রত্যাশী হইয়া নারী পুরুষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাব সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে আর চায় না। আপনার শক্তির উৎস নারী আবিষ্কার

করিয়া আত্মবিশ্বাসী ঃ স্বকীয় মাধুর্যপ্রেম শক্তি ও দৃঢ়তা দিয়া আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে আধুনিক যুগের নারী উৎসুক। পরমুখাপেক্ষী হইয়া সে আর থাকিতে রাজী নয় ঃ জীবনসংগ্রামে সে আপন সৌভাগ্যের পথ নিজেই খুঁজিয়া লইতে চায়। নারী আর পুরুষের ছায়ার অনুগামী হইতে চায় না ঃ পুরুষই নারীর প্রেম ও শক্তির মর্যাদা ও মহিমা অনুভব করিয়া তাহাকে বরমাল্য দান করিয়া কৃতার্থ হইবে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

* * * *

যাবনা বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী-
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণ দীপ্তি গোধূলিতে।

কভু তারে দিবনা ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
—সবলা

কবিকল্পনা বিচিত্র মানবজীবনকে এক ভাবসঙ্গতি ও ঐক্যমিলনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছে : বিপুলবিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতিকেও কবি ভাব ও কল্পনার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দিয়া রসাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুরূপকে কবি উপেক্ষা তো করেনই নাই, বরং ইহার বর্ণগন্ধ কবির রসচিত্তকে উদ্বেল উল্লসিত করিয়াছে; ইংরেজ কবি কীটসের মতো বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস সকল ইন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়া তিনি সর্বান্তকরণে উপলব্ধি ও উপভোগ করিয়াছেন; আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো ইহার এক ভাবরূপ কল্পনা করিয়া বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য অনুভব করিয়া দিশাহারা ইন্দ্রিয়-কামনাকে স্থিরস্তব্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতির দৃশ্যগানগন্ধে উতল কবিচিত্ত ভাব-বিলাসে বিধুর বিভোর হইয়া উঠে। বস্তু-বিশ্বের বর্ণসঙ্গীত ভোগ করিয়া কবির রসচেতনা তৃপ্ত হইতে পারে নাই : সর্বপরিব্যাপ্ত বিশ্ব-প্রাণের কল্পনা করিয়া কবি নিশ্চিন্ত হইলেন। ধূপ কবিকে আকর্ষণ করে, গন্ধ তাকে

মুগ্ধ করে ; ছন্দে শুধু কবিমন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারে না, সে চায় সুরের মধুর স্পর্শ ; রূপ কবির কামনাকে জাগ্রত করে, ইন্দ্রিয়কে সুধাময় করিয়া দেয় ; কিন্তু ভাবহীন রূপ রবীন্দ্রনাথের রসচিত্তকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। বহির্বিশ্বের বিচিত্র রূপসমারোহ ও অজস্র বস্তুবৈভব কবিকে মোহিত করিলেও কল্পনা দিয়া কবি ইহাদের ভাবসম্পদ উদ্‌ঘাটিত না করিয়া শান্তি পান নাই। মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির এই দ্বৈত রূপের কোনো একটাকে কবি একান্ত একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন না ; ইহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বকীয় মর্যাদা স্বীকার করিয়া কবি ইহাদের সম্মিলিত সুষমা ও সমবায়ের সম্পূর্ণতা কল্পনা করিয়াছেন। ইহারা স্বতন্ত্র হইলেও ইহারা কবির ভাবলোকে এক অখণ্ড সম্পর্কে সংপৃক্ত ও সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিকল্পনা বিচিত্র জীবনপ্রকাশ ও অজস্র রূপাভিব্যক্তিকে অনুভূতির ঐক্যসূত্রে এক মিষ্টিক রসচেতনায় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বৈচিত্র্যের অন্তর্বর্তী সর্বাঙ্গীন এক মহাসঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা সমগ্র বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া কবি কল্পনা করিয়াছেন। ধূপ ও গন্ধ ছন্দ ও সুর রূপ ও ভাব সীমা ও অসীম মিলিয়াই কবির কল্পলোক সম্পূর্ণ। এই দার্শনিক তত্ত্বটি নূতনও নয়, মৌলিকও নয় : হিমালয়ের মতো ইহা প্রাচীন ; প্রাচীন ও আধুনিক যুগে সকল দেশের মিষ্টিক কবি ও দার্শনিক

এই সহজ সাধারণ বিশ্বাস পোষণ করিয়া জীবনের বিভ্রান্তকারী জটিল বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে বৈচিত্র্য ও জটিলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে: বিরোধ সংঘাত কমে নাই। তবু রোমাণ্টিক কবিরা দেশে দেশে জগতে ও জীবনে এক মধুর সঙ্গতি ও মিলের কল্পনা করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই অতি পরিচিত সহজ বিশ্বাস ও সাধারণ তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ লিরিক সঙ্গীতে ও সুষমায় কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন: প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি মানবজীবনের প্রাণহীন পটভূমিকা মাত্র নয়: প্রকৃতির সহিত কবির একটি গভীর ভাবের আত্মীয়তা আছে; মানুষের সহিত বিশ্বের নাড়ীর টান রহিয়াছে। বিশ্বজীবনের সহিত কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি নিবিড় ভাবসম্পর্ক আছে: মানুষের প্রাণ বিশ্বের মহাপ্রাণধারায় নিত্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে; মানুষ বিশ্বপ্রাণের অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ। প্রকৃতিকে ভালোবাসিবার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথ কোনো নৈতিক পরামর্শ পাঠকদের দেন নাই; নিজের ভাব ও শিল্পীজীবনে প্রকৃতির গভীর সর্বাঙ্গীন প্রভাব সর্বান্তকরণে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতির একটি নিজস্ব সত্বা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব কবি স্বীকার করেন:

বিশ্বপ্রকৃতি আপন সুখদুঃখ ঘরকন্না লইয়া দিনরাত্রি ভরিয়া তুলে ; তারো একটা বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি জীবনধারা রহিয়াছে। আমাদের ঘরের আশেপাশে চারিদিকে প্রকৃতির বিচিত্র জীবনপ্রবাহ অব্যাহত ধারায় চলে ঃ সে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন নিত্য জীবনপ্রকাশ ; অজস্র অপরূপ কাজে ভরিয়া উঠে প্রকৃতিলক্ষীর দিনরাত্রির অব্যাহত প্রহরগুলি। প্রকৃতির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত প্রেমের এক রসসম্পর্ক গড়িয়া তুলেন। কখনো তার রূপ-রস-শব্দগন্ধ উপলব্ধি করিয়া কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি মুগ্ধব্যাকুল কস্তুরী মৃগের মতো দিশাহারা হইয়া পড়ে, কখনো প্রকৃতির অদৃশ্য অন্তঃপুরে কবিকল্পনা মিষ্টিক সৌন্দর্যের অভিসারে বাহির হইয়া যায়। কখনো কবি শিল্পীর চোখে দেখেন পৃথিবীকে, কখনো দার্শনিকের। তবু এই দুই ভঙ্গি তার সমগ্র মানসলোকে অবিচ্ছিন্ন ওতপ্রোত হইয়াই রহিয়াছে ঃ একটি সমগ্র রসচিত্ত জীবন ও জগৎকে ভোগ করে বিশ্লেষণ করে দেখে ও ব্যাখ্যা করে। এই দুইটি মনোভঙ্গি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড হইয়া কবির রসচিত্তকে জাগ্রত করে ঃ কবি ও দার্শনিক একই ব্যক্তিমানসের দ্বৈত বিভূতি। মিল ও সঙ্গতির অনুভূতি যে কবিকে আশ্বস্ত করে তার নিকট আপনার চিন্তা যুক্তি ভাব ও অনুভূতির ভিতরও বিরোধ বিচ্ছেদ নাই ; বিশ্বজীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে বৈচিত্র্য

ও পার্থক্যের অন্তরালে সে এক বিপুল অসীম রহস্যময় ভাবসঙ্গতি অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু কাব্যে তত্ত্ব অপেক্ষা রসের আবেদন বেশী : রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে মিষ্টিক অনুভূতি শিল্পরস ও রোমান্টিক কল্পনাকে গভীর করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতের বিরাট বিশাল বন্যপ্রকৃতির ভয় ও বিস্ময় জাগানো রহস্যময়রূপ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইউরোপের ছিমছাম সংকীর্ণ প্রকৃতি যেন তার নিজস্ব আদিম মহিমা হারাইয়া নিতান্তই মানুষের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে; আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের শিল্পসভ্যতা ইউরোপের প্রকৃতিকে জয় করিয়া তার সকল রহস্য ভয় ও বিস্ময় জাগানো গৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছে : প্রকৃতি মানুষের যেন অতিপরিচিত শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস; বিজয়ী বৈজ্ঞানিক মানুষ প্রকৃতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। এশিয়ার প্রকৃতি তার আদিম অকৃত্রিম রহস্য ও বিশালতা এখনো হারায় নাই। তার মেঘচুম্বী পর্বত দিগন্ত-বিস্তার প্রান্তর শ্বাপদসংকুল গভীর বৃহৎ অরণ্যাণী সুদীর্ঘ বিসর্পিল আয়তবিস্তার নদনদী আমাদের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া রাখে। এশিয়ার বিপুল বিরাট বিচিত্র প্রকৃতি তার আদিম নৈসর্গিক রহস্যে আজো রোমাঞ্চিত। এশিয়ার প্রকৃতিকে মানুষ বন্দী করিতে পারে নাই : মানুষই প্রকৃতির ভয়সমাকীর্ণ রহস্যশালায় বন্দী হইয়া আছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এখনো এশিয়ার বিরাট প্রকৃতির সকল গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত

করিতে পারে নাই। এখনো আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবনধারাকে আঁকড়াইয়া ঝুলিতেছি: আমাদের বিশ্বপ্রকৃতিও তার প্রাচীন মহিমায় এখনো আমাদের শিশুমনকে ভয়ে রহস্যবোধে ব্যাকুল ও উদ্বেল করে। আমাদের কবির ভালো লাগে এই রহস্যময় আধো জানাশোনা নিকটের হইয়াও দূরের প্রাচীন বিপুল প্রকৃতির নিসর্গলীলা। বসুন্ধরা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে সর্বানুভূতি বিশ্ববোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইউরোপের প্রকৃতি ও মানুষের উল্লেখ নাই, আছে শুধু সুপ্রাচীন এশিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন জাতি ও প্রকৃতির জীবন-ধারায় আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিবার একান্ত ব্যগ্র কামনা। প্রাচীন এশিয়ার রহস্যময় বিশালবিচিত্র বন্য প্রকৃতিই কবির মনে অসীম বিশ্ববোধের প্রেরণা জাগাইয়াছে। ইউরোপের অতিপরিচিত প্রকৃতি তাহা পারিত না। আমাদের নির্বাক প্রকৃতির নিস্তব্ধ নীরবতায় যেন সুদূর অতীত মুখর হইয়া উঠে: আমাদের মানসলোকে আমরা বর্তমান অপেক্ষা প্রাচীন ও মধ্যযুগে বেশী জাগ্রত হইয়া রহিয়াছি; ভাবলোকে আমরা আধুনিক হইলেও চিন্তা ও যুক্তির ব্যাপারে প্রাচীন যুগের মানত ও মাদুলির মায়া এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। গঙ্গাযমুনা বিন্ধ্যহিমালয় এদেশের মাঠপ্রান্তর যেন প্রাচীন ভারতের প্রতীক; আমাদের জাগ্রত বর্তমানকে ঘিরিয়া তারা যেন অতীতের কাহিনী কানে কানে বলিয়া যায়।

বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপরঙের বর্ণনা কবির কাব্যে পাই। প্রকৃতির রুদ্রভৈরব শান্তসুন্দর এই দুই বিভিন্ন প্রকাশের বিচিত্র রূপ আঁকিলেও রবীন্দ্রনাথের রসচিত্ত ও মিষ্টিক চিন্তা শান্ত স্থির নিসর্গের গভীর নীরবতা অনুভব করিতেই ব্যগ্র। বর্ষাবসন্ত শরতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপসমারোহ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছেঃ প্রকৃতির সুখদুঃখ আনন্দবেদনা ঋতুপরিক্রমায় পুষ্পপল্লবে আকাশে আলোতে বর্ণেগন্ধে যখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তখন কবির মনে তার সাড়া স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জাগাইয়াছে। প্রকৃতির রূপসজ্জা সকল ঋতুতে কবির বাঁশী কাড়িয়া লইয়া নিজের সুরঝংকার বাজাইয়া তুলিয়াছে। আকাশ তাহাকে আকুলিয়া ধরে, ফুল তাহাকে ঘিরিয়া বসে, জ্যোৎস্নাপ্রবাহ তার শিরায় শিরায় আনন্দের জোয়ার ডাকিয়া আনে; কুসুমকাননে বিভোরের মতো কবি ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু এই মূর্তিস্রোতে কবি ভাসিয়া চলিতে বেশীক্ষণ পারেন না; তার মন অতৃপ্তি ও পিপাসায় কাতর হইয়া গভীর কোনো অনুভূতি লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রকৃতির ধ্যানময় স্থির শান্ত নির্জন নীরবতা কবির চঞ্চল মনকে ভাবনিবিষ্ট করিয়া দেয়। কবিকল্পনা ভাবলোকের অদৃশ্য অসীম আকাশতলে সঞ্চরণ করিতে ব্যগ্র। প্রকৃতির নির্জন পরিবেশ কল্পলোকের নিদ্রিত রাজপুরীর সিংহতোরণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। রূপকথার রাজপুত্রের মতো কবির

নিঃসঙ্গ কল্পনা সুপ্ত প্রাসাদের সাতমহল প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশব্দে রাজকন্যার মণিহর্ম্যের সন্ধানে বাহির হইতে চায়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা নির্জন প্রকৃতির প্রশান্ত নীরবতায় বিশ্বপ্রাণের সহিত আপনার যোগসূত্র আবিষ্কার করে : দেশ কালের সীমাহীন অসীম নীরবতায় কবি যেন বিশ্বের চিরন্তন পরিচয় লাভ করেন ; নির্জনতালোভী কবিচিত্ত কল্পনা দিয়া দেশকালের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে এক মহাজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতে চায় : এই সর্বানুভূতি কবির কল্পনাবিলাস। কবি নগর অপেক্ষা ভালোবাসেন পল্লীপ্রকৃতি ; কারণ সহরে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ মানুষ পায়না ; গ্রামে মানুষের চেয়ে প্রকৃতির আধিপত্য বেশী ; তাছাড়া নগরপ্রকৃতি রুক্ষরূঢ় কর্মকলরবমুখর, পল্লীপ্রকৃতি মধুরমেদুর শান্তশীতল মৌন নীরব। রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনা পল্লীপ্রকৃতির শান্তমধুর পরিবেশেই আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। সহরে প্রকৃতি যেন স্বকীয় মর্যাদা হারাইয়া শ্রীসমারোহহীন বৈধব্য ধারণ করিয়াছে। এখানে কবিকল্পনা রসের প্রেরণা লাভ করে না ; উদার পথঘাট খোলা ধূধু মাঠ শ্যামল তালবন দিঘির কালোজল পাখীর গান বনের ছায়া বাঁশবনের মাথায় বাঁকা চাঁদ কবিকে কল্পলোকের ‘রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে’ লইয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির ভীমকান্ত প্রকাশ ঝড়ের রুদ্র নৃত্যের প্রলয় ঝংকার

সমুদ্রতরঙ্গের উদাত্ত নির্ঘোষ রবীন্দ্রনাথ শুনিয়াছেন সত্য, কিন্তু তার জীবনদর্শন ও কল্পনার লিরিক সুষমা ঝড়ঝঞ্ঝার দুর্বার দুর্জয়তাকে মোলায়েম মসৃণ করিয়া তুলিয়াছে, সমুদ্রের ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকে মোহন মধুর করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে ঝড় পূর্ব বঙ্গের সমুদ্র অরণ্য মন্থনকারী দুরন্ত উন্মত্ত মৃত্যু ও ধ্বংসের আকস্মিক দুর্বিনীত আবির্ভাব সাইক্লোন নয়, সে মেঘমন্দ্রিত বিদ্যুৎ চমকিত পশ্চিম বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশতলে নির্জন প্রসারিত প্রান্তরে শালবনে খেয়ালী হাওয়ার চপল নৃত্য-হিন্দোল মাত্র। কালবৈশাখী যেন আপনার প্রাকৃতিক ভয়াবহ দানবীয় শক্তি ঐশ্বর্যসমারোহ হারাইয়া কবির কাব্যে মধুর মোহময় সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই ঝড়ে দুর্জয় চপলতা আছে, কিন্তু ইহাতে বজ্রপাত নাই, ইহাতে বিক্ষোভ আছে, কিন্তু ইহা উদ্‌ভ্রান্ত করে না, ইহা ব্যাকুল করে কিন্তু ভয় জাগায় না। ঝড়কেও রবীন্দ্রনাথ আপনার রোমান্টিক কল্পনা দিয়া বেশ লিরিকাল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতি ও জীবনে যা কিছু বন্ধুর ব্যবধান অসমান বৈপরীত্য রহিয়াছে কবি তাহাদের কল্পনা দিয়া মসৃণ মধুর করিয়া ভাবলোকের সঙ্গতি সুষমায় মোলায়েম মেদুর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব জীবন কল্পলোকের মতো সুন্দর শান্তও নয়, মসৃণ সঙ্গতি মিলে মধুর হইয়াও উঠে নাই। কবির রোমান্টিক কল্পনার লিরিকলাবণ্য প্রকৃতির ভীম ভৈরব প্রকাশকেও মধুর ও মোহময় করিয়া প্রকাশ

করিয়াছে। পূর্বকল্পিত এক পরিচিত ও দার্শনিক তত্ত্ব দিয়া রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রকৃতি ও জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে : জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর কবি একটি ভাবসঙ্গতি ও সুষমা অনুভব করেন। কবির রোমান্টিক কল্পনা এক সর্বাঙ্গীন বিশ্বব্যাপী মিল ও ভাবের ঐক্য দেখিয়া উল্লসিত হইতে চাহে। জগতে ও প্রকৃতিতে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব পরিবেশে কবি যাহা সম্পূর্ণ দেখিতে পান নাই, কল্পনা দিয়া জীবনের এই অভাব অসম্পূর্ণতা ভরিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। জীবনে যাহা নাই, কল্পনায় তাহাকেই কবি কামনা করিলেন। বাস্তব জীবনে অভাব অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য এমন ব্যাপক ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে কবির রোমান্টিক কল্পনার এই মিলসঙ্গতির ভাবাদর্শ পাঠকমনকে আশ্বস্ত করিতে পারে না।

সকল ঋতুর গান কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে মিলিবে : বর্ষা বসন্ত ও শরৎ সম্পর্কে তার রচিত গান অনেক। ইহার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের রসচিত্ত একদিকে এই সকল ঋতুতে বিশ্ব-প্রকৃতিব রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিবার সুযোগ পায়, অন্যদিকে কবির দার্শনিক ও রোমান্টিক কল্পনা ভাবলোকে বিহার করিবার উপযুক্ত বস্তুপরিবেশ খুঁজিয়া পাইয়াছে। বর্ষার মেঘাড়ম্বর ও বারিধারাসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল বসুন্ধরায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপতন বিদ্যুদ্দীপ্ত বজ্রধ্বনির উদাত্ত সঙ্গীত সমারোহ কবিমনকে

শুধু বিশ্ব-প্রকৃতির ঋতুরূপের ঘনঘটায় আকুল করে না, তাহাকে 'বিরহের স্বর্গলোক কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে' লইয়া যায় যেখানে 'মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।' বর্ষার শীতল শ্যামল সমারোহে কবিকল্পনাকে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে অভিসারে লইয়া যায়। পুষ্পিত বসন্তে বন্ধনহীন উন্মত্ত অধীর ফাল্গুনদিনে যখন 'উড়ায়ে চঞ্চলপাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা দক্ষিণসমীর সহসা আসিয়া ত্বরা' যৌবনের রাগে ধরাকে রাঙাইয়া দেয় তখন 'উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে' কবি 'কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায় কত অনুরাগে।' বসন্তের সুরভিত দিনগুলি কবিকল্পনাকে মাধবীস্বপ্নে চঞ্চল বিভোর করিয়া রাখে। বর্ষায় কবিমন মিষ্টিক হইয়া উঠে : বসন্তে চঞ্চল ভ্রমরের মতো কুসুমিত প্রকৃতির যৌবনসুধা আহরণ করিতে ব্যাকুল। বসন্ত কামনাকে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা করিয়া দেয় : বর্ষা কবিমনকে কামনার মোক্ষধামের পথে লইয়া যায়। শরতের শান্ত-নীরব স্নিগ্ধোজ্জ্বল রৌদ্রমেঘের আল্পনায় সাজানো দিনগুলি কবির মনকে মধুর বেদনায় উদাস করিয়া দেয়। প্রকৃতির রূপসজ্জা ঐশ্বর্যসমারোহ কবিকে মুগ্ধ করে ; ভাবের রহস্যলোকে কল্পনাকে উধাও করিয়া দিতেও কবির ব্যাকুলতা কম নয়। কবির রসচিত্ত নিত্য রূপে ও ভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে : এই রসাভিসার রোমান্টিক কবিকল্পনার প্রধান লীলা। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে এক অজানা অদৃশ্য

রহস্যের কল্পনা করিয়া কবিমন আনন্দিত হয়। কল্পনা দিয়া কবি প্রকৃতিকে নূতন আভরণে সৃষ্টি করেন : কাব্যে গানে যে প্রকৃতির সহিত আমাদের দেখা হয় সে প্রকৃতি ঠিক আমাদের অতিপরিচিত প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ পরিবেশের আকাশ আলো পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর নয়; ইহারা যেন কল্পনার রসে-রূপে বর্ণে-গন্ধে সজ্জিত-সুরভিত ভাবলোকের ভাস্বর প্রতিমাগুলি উৎসবের দিনে ঐশ্বর্যসমারোহের দীপ্তি ছড়াইয়া মিছিল করিয়া চলে। বিভিন্ন ঋতুতে কবিমনে যে বিচিত্র অনুভূতির উদয় হয় তার প্রেরণা আসে গভীর সৌন্দর্যের রসবোধ ও রহস্যাবেশ হইতে। প্রকৃতির একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় জীবনসত্বা ও ব্যক্তিত্ব কবির রসচিত্ত সহজে মানিয়া লইয়াছে, আমাদের প্রতিবেশী বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির একটি রসসম্পর্ক রহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির চালচলন জীবনধারার সকল গোপন রহস্য কবির জানা নাই, ইহাতে কবির দুঃখও নাই। বরং এই অজানা অস্পষ্ট রহস্য প্রকৃতিকে কবিকল্পনায় আরো লোভনীয় মোহময় করিয়া তুলে। বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল বিরাট বৈচিত্র্যময় জীবনের অজ্ঞাত অদৃশ্য রহস্য কবির রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে : যাহা অজানা অস্পষ্ট অদৃশ্য ও অজ্ঞাত যাহা শুধু আকৃষ্ট করে অথচ ধরা দেয় না, যাহা বাসনা জাগায় কিন্তু আমাদের মনকে চির-অতৃপ্ত রাখিয়া যায়, যাহা যাযাবর বন্যহাঁসের মতো পথের বাঁকে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আমাদের সকল কৌতুহল ও আগ্রহকে

জাগাইয়া দিতে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, সেই রহস্যানুভূতি রোমান্টিক কল্পনা ও কাব্যের সঞ্জীবনী সুধা। একটি গভীর বেদনার করুণ সুর বেহাগরাগে রোমান্টিক কাব্য ও গানকে ব্যথিত করিয়া তুলে। বেদনার আনন্দবিলাস আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্যের একটি সাধারণ বিশেষত্ব। সাম্য স্বাধীনতাহীন জীবন পরিবেশে মনুষ্যত্বের অনিবার্য ব্যর্থতার সকরুণ ক্রন্দনকে সহনীয় করিয়া তুলিবার ইহা সাহিত্যিক নিষ্ফল প্রয়াস। জীবনে ও প্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর ও মধুর মসৃণ ও কোমল রবীন্দ্রনাথের লিরিক শিল্প ও রোমান্টিক কল্পনা তাহাকেই সন্ধান করিয়া ফিরে। কল্পনা দিয়া কবি জীবন ও জগতকে রসায়িত মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

দেহের রূপ প্রকৃতির শব্দগন্ধবর্ণবিলাস কখনো কবি উপেক্ষা করেন নাই ঃ কীটসের মতো বস্তু-বিশ্বের বিচিত্র রূপরঙের ঐশ্বর্যসমারোহ কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উষ্ণ ও উজ্জ্বল করিয়া দেয় ; নিবিড় ইন্দ্রিয়-উল্লাসে কবি-মন সচকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। জীবন ও প্রকৃতির বর্ণগন্ধের বিচিত্র সমারোহের প্রতি কবির তীব্র আকর্ষণ আছে। কিন্তু রূপের সৌন্দর্য ও মাধুর্য কবির কামনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিবিড় আনন্দে রাঙাইয়া দিলেও কবির রসানুভূতি ও কল্পনা ভাব ও তত্ত্ব দিয়া রূপকে গলাইয়া নূতন রূপ সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত হইতে চাহে। শুধু রূপরসগন্ধ কবিকে গভীর আনন্দে উল্লসিত চঞ্চল ও চমকিত

করিলেও আশ্বস্ত ও আতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ভাব দিয়া রূপকে কল্পনার গোধূলি-আলোর রহস্যে অস্পষ্ট ও অপরূপ করিয়া তবে কবি খুশী হইয়াছেন। 'যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যগন্ধগানে' রবীন্দ্রনাথ সবই উপভোগ করিতে ব্যগ্র: 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসন' কবির জন্য নহে। তবে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়া ইন্দ্রিয় উপভোগের একটি তাৎপর্য অনুভব না করিলে কবি স্থির হইতে পারেন না: রসের সহিত তত্ত্বের একটি সঙ্গতি ও মিল কল্পনা করিয়া তবে কবি শান্তি সোয়াস্তি লাভ করেন। পূর্বকল্পিত দার্শনিক মতবাদ দিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের সংকীর্ণ সীমার স্থূল বাস্তব স্পষ্টতাকে কবি সুকুমার ভাবলোকের অজানা রহস্যে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। রোমান্টিক কবিকল্পনা বাস্তব জীবনের উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত স্পষ্ট রূপকে নিজের খেয়ালখুশী মতো ভাবানুভূতি দিয়া রসসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবের বন্ধুরতা ও রূঢ়তা কবিকল্পনায় মসৃণ ও মধুর হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষ জীবন ও জগতকে কবি উপেক্ষা কখনো করেন নাই, তবে কল্পনার উন্মুক্ত উদার আকাশদিগন্তে জীবনের জটিল নিষ্ঠুর বাস্তব পরিবেশ হইতে দূরে নির্জন ভাববিহারে ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বিপুল বিচিত্র বিশ্বজীবনে সঙ্গতি ও মিলের এক গভীর মিস্টিক কল্পনা দিয়া বিহারীলাল তার গীতিকাব্যকে রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছেন। এই দার্শনিক চিন্তা বহুদিন হইতে শুধু ভারতবর্ষে

নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে যখন ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের পুনরুত্থান দেখা দেয় তখন শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ কল্পনা দিয়া জটিল বিচিত্র জীবন ও জগতের অন্তর্মূলে এক সঙ্গতি সামঞ্জস্যের বিশ্বনীতি আবিষ্কার করিয়া শান্ত হইয়াছেন: শেলী মনে করেন প্রেম ও সৌন্দর্য বিশ্বজীবনেব মুখ্য প্রেরণা; এক সচেতন সদাজাগ্রত ও সক্রিয় মহাপ্রজ্ঞা বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া জগৎ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কল্পনা করেন। শেলী ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যশিল্প ও জীবনদর্শনে মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও জীবনের ঐক্যানুভূতির মিস্টিক কবিকল্পনা দুইজনের গীতিকাব্যকে নিবিড়ভাবে রোমান্টিক করিয়াছে। আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙালী কবিরা সাহিত্যিক প্রেরণা লাভ করিয়াছেন আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ করিয়া ইংরেজী কাব্য উপন্যাস হইতে। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই ধরণের মিস্টিক কল্পনা বিহারীলাল প্রবর্তন করেন; আধুনিক ইংরেজী বোমান্টিক কাব্য তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাব্যশিল্পকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে বিহারীলালের গীতিকাব্য ও উনবিংশ শতকের ইংরেজী রোমান্টিক কবিতা ও ভিক্টোরিয়ান যুগের কাব্য। জীবনে ঐক্যানুভূতি স্বাধীন সহজভাবেই যে কোনো কবির মনে জাগিতে পারে, বিশেষ করিয়া আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে যখন এই বিশ্বাস প্রবল।

এই জন্য ইউরোপীয় সাহিত্য কাব্য পড়িবার প্রয়োজন হয় না। তবে কাব্যে এই বিশ্বাস ও অনুভূতির একটি বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি আছে: এই শিল্পভঙ্গি আধুনিক বাঙালী কবিরা শিখিয়াছে ইংরেজ কবিদের কাছে। জীবনের মূলে মিল আছে, সঙ্গতি সামঞ্জস্য আছে এই অনুভূতি মৌলিকও নয় কৌতুহলোদ্দীপক আবিষ্কারও নয়: বহুদিন হইতে পৃথিবীর মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কাব্যে ইহার তাৎপর্য প্রকাশের একটি বিশিষ্টতা আছে। বিভিন্ন কবি ইহার বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন: তাহাদের প্রকাশের শিল্পভঙ্গিও স্বতন্ত্র। পুরাতন প্রচলিত মতকে নূতন করিয়া লিরিকভঙ্গিতে আধুনিক কবিরা রোমান্টিক কাব্যে প্রকাশ করিয়াছে। এই শিল্পভঙ্গি বাঙালী শিখিয়াছে ইংরেজী কাব্য হইতে। তবু আমাদের কবিদের প্রকাশ ভঙ্গিতে মৌলিকতার অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের লিরিক কাব্য-শিল্প ইহার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও রসানুভূতি অতিশয় গভীর ও ব্যাপক ছিল বলিয়া কবি বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন ও বিচিত্র জীবনপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন; তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলিষ্ঠ ও সচেতন ছিল বলিয়া কবির ভাবদৃষ্টি ব্যাপক সর্বগামী ও নিবিড় হইতে পারিয়াছিল; তার কল্পনা সর্বদিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল; জীবনের বিচিত্র রূপরসে শব্দগন্ধে তাহা আনন্দ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছে। এই বিপুল বিচিত্র কবিকল্পনা

ভাব ও রূপ বাস্তবজীবন ও মানসলোকের ভিতর মিলন ও সমন্বয় সাধন করিতে চায়; ইন্দ্রিয় দিয়া জাগ্রত চেতনায় জীবনের বর্ণগন্ধের মদির রসভোগ করিয়া কল্পনা দিয়া জীবনের ভাব তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া এই দ্বৈত উপলব্ধির সঙ্গতি ও মিল খুঁজিয়া পাইয়াছে। রোমান্টিক কবি কল্পনা দিয়া জীবনের ভাবমূর্তি গড়িয়া তন্ময় আনন্দে ও বিস্ময়ে বাস্তব জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে ভালোবাসে, জীবন দিয়া কল্পনাকে গড়িতে চায়না। কল্পনার এই গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে শিল্প-প্রয়োজন অনুসারে ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলালের হাতে বাংলা কাব্যের ভাষা গঠিত ও উন্নত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ঃ প্রত্যেক কবি আপনার ভাবানুভূতি ও কাব্যরচনার প্রয়োজন অনুসারে স্বকীয় কাব্যের ভাষা ও ছন্দ গঠন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অতিশয় গীতিধর্মী ব্যাপক বিচিত্র কল্পনার কুশল প্রকাশের পক্ষে প্রচলিত বাংলা কাব্যের ভাষা ও ছন্দ পূর্ণ ও পর্যাপ্ত ছিলনা। কবিকে আপন কল্পনা ও কাব্যশিল্পের তাগিদে নূতন করিয়াই ভাষা ও ছন্দকে মাজিয়া ঘষিয়া পরিচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত করিতে হইল। মোহিতলাল লিখিয়াছেন ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব হইতেই যে রূপসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহাই যেন আরো পরিশুদ্ধ হইয়া একটা পূর্ণতর বাণীসাধনার আশায় আমাদিগকে উন্মুখ করিয়াছিল।

—আধুনিক বাংলা সাহিত্য। বাস্তব জীবন পরিবেশের মতো কাব্য ও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি ভাষা ও ছন্দের কারিগরিও বদলায়।

আধুনিক যুগের বিভিন্ন দেশের রোমান্টিক কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথেব গীতিকাব্যের মৌলিক পার্থক্য নাই; তবে অন্য কোনো কবির গীতিকাব্য কল্পনায় এমন বিচিত্র রসানুভূতিতে সর্বত্র সরস ও নিবিড় হইয়া উঠে নাই। কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের সহিত বিচিত্র ভাবের রস-সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া যায়। যুক্তি দিয়া বিচার করিলে রোমান্টিক কল্পনা কৌতুহলী মূঢ় শিশুমনের হাস্যকর স্বপ্নবিলাস বলিয়া মনে হয়। তাহাতে শিশুর অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সরসতা রহিয়াছে। ভাবানুভূতিব বৈচিত্র্য ববীন্দ্রনাথের কল্পনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে: এই বিচিত্র ভাবপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন একদিকে সংস্কৃত বৈষ্ণব কাব্য ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে, অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল জটিল সংঘাত ও সংঘর্ষ—বিক্ষুব্ধ জীবন পরিবেশ হইতে। কবিকল্পনার এই বিশ্বব্যাপকতা রবীন্দ্রকাব্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: সর্বত্র মৌলিক না হইলেও বিচিত্র রসানুভূতিতে তার কাব্য সরস ও সমুজ্জ্বল। সর্বানুভূতি তার কল্পনাকে প্রসারিত ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান বিভিন্ন জাতি মানুষ ও দেশকে পরস্পরের কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে। ইহাতে আধুনিক কবিদের কল্পনা

স্বদেশের সীমান্ত ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে উদ্‌গ্রীব ঃ দেশে দেশে যোগাযোগ যতই বাড়িতেছে আধুনিক শিল্পসাহিত্যের পটভূমিকা ততই বিস্তার লাভ করিতেছে। ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীসাহিত্যিকদের কল্পনার প্রাদেশিকতা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। রিক্থ হিসাবে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হইতে উদার সার্বভৌমিক মনোভঙ্গি লাভ করিলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কবিকল্পনা উদার আত্মপ্রসারের সহজ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যতই বিস্তার লাভ করিয়াছে ততই মিষ্টিক ও দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে। জগতের বৈচিত্র্য ও জীবনের বিরোধ লক্ষ্য করিয়া বিচলিত কবি বিশ্বজীবনে ঐক্য ও মিলনের কল্পনা করিয়া আশান্বিত ও আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছেন ; কর্মজীবনের ব্যর্থতা দুঃখ দারিদ্র্য এমন কি মৃত্যুও তাহার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা হইতে মুক্ত হইয়া কবির কাছে সহনীয় ও সার্থক হইয়া উঠিল। জীবনের সকল বৈচিত্র্য ও বন্ধুরতা বিরোধ ও বৈপরীত্য বিভিন্নতা ও ব্যবধান বিশ্বব্যাপী দেশকালের সংকীর্ণ সীমানার উর্ধলোকের এক মহা-সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের কল্পনা দিয়া কবি মসৃণ ও মধুর ইন্দ্রিয়াতীত ও রহস্যময় করিয়া দিয়াছেন। ভাব দিয়া জীবনের অনুভূতি দিয়া বাস্তবের নবসৃষ্টি করিয়া

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা উল্লসিত হইয়া উঠে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের স্বকীয় মর্যাদা সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইলেও কবিকল্পনা ভাবের সীমাহীন রসলোকে উধাও হইয়া যাইতে ভালোবাসে। সুরদাসের প্রার্থনা, অনন্ত প্রেম, মেঘদূত, মানসসুন্দরী, সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা, প্রেমের অভিষেক, নিরুদ্দেশ যাত্রা, চিত্রা, আবেদন, উর্বশী, জীবন-দেবতা, সিন্ধুপারে, প্রণাম প্রভৃতি কবিতায় কবির উদার মিষ্টিক কল্পনা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

জীবন ও জগত কবির চোখে ভাবের গভীর এক স্তব্ধ রহস্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিয়া কল্পনার কৌতূহলের অন্ত নাই। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার আগ্রহ কবির নাইঃ কারণ পথ চলাতেই কবির নিবিড় আনন্দ। জীবন ও প্রকৃতি চির রহস্যময় বলিয়াই তো কবির গান ও কাব্যের প্রেরণা আসে। জীবনের এই রহস্যময়তা রোমান্টিক কাব্যের প্রেরণা হইলেও একটি চির অতৃপ্তি ও বেদনা কবিকল্পনাকে ব্যাকুল করে। একদিকে বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিপুলতা ও ভাবের রহস্যময় অসীমতা, অন্যদিকে বাস্তব জীবনে অপূর্ণতা লাঞ্ছনা অপমান দুঃখ অন্যায় ও অবিচার ও কল্পনার সহিত বাস্তবের চির-জাগ্রত অপূরণীয় ব্যবধান ও বিরোধ কবিকল্পনাকে ব্যথাতুর করিয়া দেয়। কবি কামনা করেন এক সৌন্দর্য মাধুর্যময় পরিপূর্ণ সঙ্গতি মিলে সমৃদ্ধ জীবন ঃ কিন্তু এই পৃথিবীতে এ কামনা কখনো পূর্ণ হইতে পারে না ; কল্পনায় কবি যার ক্ষণিক

ভাবসঙ্গ লাভ করেন বাস্তব জীবনের দৈনিক পরিবেশে তার ইঙ্গিতও খুঁজিয়া পান না বলিয়া কবিদের নৈরাশ্য ও ক্রন্দনের আর শেষ নাই। তবে রোমান্টিক কাব্য বেদনা ও দুঃখকেও আনন্দঘন করিয়া প্রকাশ করে : বেদনার ভাববিলাস আধুনিক যুগে সকল দেশের রোমান্টিক কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। অশ্রুস্নাত রোমান্টিক কাব্য অতৃপ্তি ও বেদনার শিল্পিক আনন্দে উচ্ছ্বসিত। বেদনার বিলাসিতা রোমান্টিক সাহিত্যের প্রধান আভিজাত্য। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ বেদনাকে ভাবের স্পর্শমণি দিয়া সকল রুক্ষতা বন্ধুরতা হইতে মুক্ত করিয়া উদাস নির্লিপ্ত করুণ মাধুর্যে বিভাসিত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে ব্যথা বেদনা দুর্দশা দুর্ভাগ্য আছে কবি সেখানেই জীবনকে নিবিড় করিয়া অনুভব করেন : আঘাত ও ব্যাঘাতে অবিচল কবির বক্ষে দুঃখের দিনে জীবনের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে। মৃত্যু ভানুসিংহের কাছে শ্যামসমান : মৃত্যু তাকে অমৃত দান করে। যে মরণ কবির কানে চুপি চুপি কথা বলে সে ধীরে ধীরে আসিয়া কবিকে নব-যাত্রার অজানা পথে জগতে জগতে লইয়া যায়। জীবনের চেয়ে মৃত্যুর ভাবমাধুর্য ও সৌন্দর্য কম নয়। কবির কল্পনায় অজ্ঞাত অসীম বলিয়াই মৃত্যুর রহস্য গভীর ও অন্তহীন। গভীরের স্পর্শ চাহিয়া কবি অধরার পিছু পিছু ছুটিয়াছেন ও বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে প্রয়াস করিয়াছেন।

দুঃখ বেদনা মৃত্যুর গান গাহিলেও কবি চিরকালই আশাবাদী।

মানব সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের মহাসংকটের দিনেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের মর্যাদা ও গৌরবের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারান নাই। হিংসা বিরোধ দ্বেষ ঈর্ষা যুদ্ধ প্রতিযোগিতা অন্যায় অবিচারে বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত আধুনিক পৃথিবী প্রলয়-ধ্বংসের ভিতর হইতে বহ্নিস্নান করিয়া নূতন ভাস্বর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে। জীবনের প্রতি কবির গভীর মায়া মমতা, মানুষের প্রতি নিবিড় তার প্রেম ও শ্রদ্ধা। বারে বারে সংকট ও বিপ্লবের সম্মুখীন হইলেও প্রাত্যহিক পরিচিত মানুষের সহজ সাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত মমতা দরদ ও মানবতায় সমৃদ্ধ জীবন অব্যাহত গতিতে চলিবে। অত্যাচার অবিচার পরাধীনতা সাম্রাজ্যবাদ মনুষ্যত্বের অবমাননা কখনো জয়ী হইতে চিরস্থায়ী হইতে পারে না: সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী মমতা ও মানবতার আদর্শ বার বার লাঞ্ছিত হইলেও প্রতিবারই তাহা ক্রমবর্ধিত গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। বিরোধ অপেক্ষা মিলনের, সংগ্রাম অপেক্ষা শান্তির বাণী ও জীবনের বেশী পক্ষপাতী মানুষ কখনো হিংসা লোভ বর্বরতার মহাদানবের কাছে পরাভব স্বীকার করে না। স্বভাবত শান্তিপ্রিয় হইয়াও রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষে 'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে' তাহাদের ডাক দিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের মতো কবি সাধনা কবিতায় জীবনের ব্যর্থতা ও বিফলতাকেও সম্পূর্ণ সার্থক সুন্দর বলিয়া মনে করেন:

আদর্শের সার্থকতা সাধনায়, সিদ্ধিতে নয় ; মানবজীবনের গৌরব কৃতকার্যতায় নহে, সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রাণপণ প্রয়াসে। রোমান্টিক কবিরা নিষ্ফলতাকে আয়ডিয়ালাইজ করেন। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ তার মিষ্টিক কল্পনা ও সর্বানুভূতি হইতে উৎসারিত। কাব্যে নিরাশা ও বেদনার স্বর থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো সংশয় ও নিরাশাবাদ প্রচার করেন নাই। তার মৌলিক জীবনদর্শনের সহিত সংশয় ও নিরাশার সামঞ্জস্য নাই। মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা ও মনীষার অপরিসীম বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনায় কবি চিরকাল বিশ্বাসী ছিলেন। কবির মানবতাবোধ এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মানবসভ্যতাকে কখনো অবিশ্বাস উপেক্ষা করেন নাই, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের গৌরব তিনি তুচ্ছ করেন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা কবিকে ব্যথিত করিলেও বিচলিত করে নাই ঃ আপন বিশ্বাসে তিনি সুদৃঢ় অবিচল অকুণ্ঠিত ছিলেন।

বেসেছি ভালো এই ধরারে
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান,
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।

রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম ;
অনেক তৃষ্ণা অনেক ক্ষুধা
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম। —**প্রণতি**

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

* * * *

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়াব আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।
—**মধুময় পৃথিবীর ধূলি**

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি,
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,

সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।   মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে হবে লোপ অকস্মাৎ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব দ্যূতচ্ছলে মানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

—জন্মদিন, ১৯৩৯

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্রসংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্চ্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।

* * *

শ্মশান বিহার-বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান

বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

—**জন্মদিনে, ১৯৪০**

রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে মিষ্টিক ভাবানুভূতি ও রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য থাকাতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্র বহ্নিরাগ ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রেমের কামনা তীব্র হইলেও কবিকল্পনার ভাবনিবিড়তা ও মিষ্টিক অনুভূতি ইহাকে পুলকিত দেহ ও সুরভিত আবিষ্ট মনের ক্ষণিক উত্তাপ ও উষ্ণভাব সংকীর্ণ মায়ামোহ হইতে মুক্ত করিয়া আকাশদিগন্তের দিকে উধাও উন্মনা করিয়া দেয়ঃ কবি বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস প্রত্যক্ষ বস্তুবৈচিত্র্যের পরিচিত চিত্রশালা ছাড়িয়া কল্পলোকের অজানা পথে অভিযাত্রী হইয়াছেন। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্র একাগ্রতা দুর্জয় উচ্ছৃঙ্খলতা ভাবের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় গলিয়া গিয়া শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। **ফরাসী** ইংরেজী কাব্যে ইন্দ্রিয় ভোগের যে নিবিড় আনন্দ আবেশ গভীর লিরিক মাধুর্যে প্রকাশ

পাইয়াছে রবীন্দ্রকাব্যে সেই আত্মহারা বিশ্ববিস্মৃত বাসনার রক্তক্ষত জ্বালা নাইঃ আসক্তি ও কামনার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বর্ণবৈচিত্র্য থাকিলেও রবীন্দ্রকাব্যে দুঃসাহসী বাসনার দুর্দম মর্মান্তিক জীবনোল্লাস নাই। শান্ত সংযম ধৈর্য ও তিতিক্ষা কবির সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আসক্তির আতিশয্য হইতে নির্মুক্ত করিয়া ভাবলোকের দেশকালহীন নির্লিপ্ত বেদনায় বিধুর করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রিয়াতীত এক ভাবরসে ও রহস্যে কবিমন ধ্যানমগ্ন। ইন্দ্রিয়ভোগের অতৃপ্তি ও চঞ্চলতা উন্মাদনা ও আলোড়ন বিদগ্ধ কবিমানসের রুচি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যেন খাপ খায় নাঃ নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত কবির রসভোগ স্থির অচপল দীপ্তিতে আকাশের দিকে অনির্বাণ একাগ্র আলোকে জ্বলিতে থাকে।

আধুনিক রোমান্টিক কাব্যে কবিকল্পনা বিস্মৃত অতীত ও লুপ্ত মধ্যযুগের সহিত যোগাযোগ সাধন করিতে ব্যগ্র। জাগ্রত বর্তমানের প্রত্যক্ষ জীবনপরিবেশের সংকীর্ণ পরিচিত বন্দীশালা হইতে কল্পনা সুদূর অতীতের বিলুপ্ত দেশকালের নিঃশব্দ রাজপুরীতে সুপ্ত রাজকন্যার অভিসারে ছুটিয়া যায়। অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নপুরীর মধুর কল্পনায় ও রোমান্টিক কাব্য গুঞ্জরিত। যা কিছু প্রত্যক্ষ স্পষ্ট জীবন্ত জাগ্রত রোমান্টিক কল্পনা তাকে যেন সহিতে পারে না, সে যা অস্পষ্ট অজানা অদৃশ্য সুদূর রহস্যময় তারই নিবিড় সঙ্গ কামনা করে। হারাণো সুদূর

পুরাতন অতীত ও অনাগত ভাবী ভবিষ্যৎ দুইই রোমান্টিক ·কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমযুগের উদার সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি সহজ মোহ আছে: তার কবিমন অতীত ভারতের তপোবন-সভ্যতার এক মোহময় পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি কল্পনা দিয়া আঁকিতে ব্যাকুল: প্রাচীন যুগটি যেন ছিল পূতপবিত্র শুদ্ধ সম্পূর্ণ মৌন শান্ত সংযত; বর্তমান যেন অতিশয় জাগ্রত কলরবমুখর ধূলিম্লান খণ্ডিত অপূর্ণ অসমাপ্ত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের শিল্পসভ্যতাকে কবি অবিশ্বাস অবহেলা করেন নাই; তবে প্রাচীন যুগেব প্রতি তার একটি নাড়ীর টান ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা উল্লসিত হয় আধুনিক ইউরোপের প্রত্যক্ষ কর্ম্মমুখর বিক্ষুব্ধ আলোড়িত প্রবল জীবন প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতা দেখিয়া নয়; সুপ্রাচীন এশিয়ার বৃদ্ধ বনস্পতিঢাকা বিস্তীর্ণ অরণ্যানী বিরাট, প্রান্তর প্রশস্ত নদনদী দিয়া বিচিত্রিত প্রাচীন জনপদের মৌনমন্থর জীবনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ ও দুর্বোধ্য প্রথা আচার রীতিনীতি দ্বারা ভারাক্রান্ত বিপুল তন্দ্রাচ্ছন্ন সভ্যতা কবিকল্পনাকে বেশী করিয়া নাড়া দেয়। বর্তমান অপেক্ষা অতীত নিকট অপেক্ষা দূর জানা অপেক্ষা অজানা রোমান্টিক কবিদের আকর্ষণ করে বেশী। অতীতকে পূর্ণতর সুন্দরতর কল্পনা করিয়া কবিচিত্ত বর্তমানের গ্লানি গলদ বিক্ষোভ ও তিক্ততা ভুলিতে চায়। স্বপ্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতীতের

সহিত বর্তমানের, ১৪০০ সাল কবিতায় বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সান্নিধ্য অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। স্বদেশ ও সংকল্প এবং নৈবেদ্য কাব্যের বহু কবিতা ও জাতীয়সঙ্গীতে প্রাচীন ভারতকে কবি কল্পনা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সাগরিকা কবিতাটিতে কবি দ্বীপময় ভারতের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অপূর্ব লিরিক ভঙ্গিতে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা ও আর্ট কোথাও নিস্তেজ নিস্প্রভ পাণ্ডুর ম্লান হইয়া পড়ে নাই। তার রচনা ও ভাব সর্বত্র সরস ও বলিষ্ঠ উজ্জ্বল ও উদ্দীপ্ত। পাঠকের মনে তার গীতিকবিতা কখনো বিরক্তি বিরূপতা বিস্বাদ ও বিরাগ জাগাইয়া দেয় না: শিক্ষিত মনে একটি সহজ রসবোধ ও আনন্দানুভূতি জাগ্রত করে। চারিদিকের ধূলিলিপ্ত প্রাত্যহিক পরিবেশ হইতে আমাদের মনকে ইন্দ্রপুরীর অদৃশ্য বাসরঘরের দিকে টানিয়া লইয়া যায়: আমাদের কল্পনা ও রসচেতনাকেও জাগ্রত করে পরিপুষ্ট করে। কবির স্বদেশসঙ্গীত ও জাতীয় কবিতা আবার বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে সজাগ সতর্ক করিয়া তোলে, আমাদের দেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করে। রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়বস্তু যাহাই হোক রচনার সরসতা সর্বত্র বিদ্যমান, কল্পনার প্রসারতা তার সকল গীতিকাব্যে ভাবের উদারতা ও আভিজাত্য আনিয়া দিয়াছে। রোমান্টিক

কল্পনা ও দার্শনিকতার সহিত প্রগতিশীল মনোভাব থাকার ফলে রবীন্দ্রকাব্যে ভাবের সরস মাধুর্য ও রচনার সুষমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই ঃ রসের সজীব প্রাণস্পন্দন ভাষায় ছন্দে ওতপ্রোত। মধুসূদন ও বিহারীলালের কল্পনায় ও রচনায় যে সবলতা ও সতেজ রসদীপ্তি দেখি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় তাহাই আরো ব্যাপক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক আর্টের লিরিক সুষমা ও মাধুর্য গভীর ও ব্যাপক ঃ শুধু তার গীতিকাব্যেই নয়, কাহিনীকাব্য ব্যঙ্গকবিতা নাটক এমনকি গদ্যরচনায়ও ভাবের রসনিবিড়তা কোমলতা ও রচনার গীতিমাধুর্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা গীতিকাব্যেই পরিপূর্ণ ও সার্থক অভিব্যক্তি পাইয়াছে। আর্ট ও কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে লিরিক মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতিকাব্যের সঙ্গীতময়তা কল্পনার ভাবগভীরতা ভাবের কোমলতা ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ভাষার মসৃণতা ও ভাবব্যঞ্জনা এবং সর্বোপরি কবির মন্ময়তা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সরস ও কোমল মধুর মোলায়েম করিয়া রসব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ সঞ্জীবিত করিয়াই কবি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ তার প্রকাশ ভঙ্গিটি সহজভাবেই লিরিকাল। ভাবের মসৃণ মাধুর্যের সহিত ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীতময়তা মিলিত হইয়া অপূর্ব রসানুভূতি সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রকাব্যের গীতিময়তা স্পষ্ট ও গভীর ঃ

কবির বহু কবিতাকে অনায়াসে গানে পরিণত করা সম্ভব; কবির গীতিকাব্যে গান ও কবিতার ব্যবধান অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে; তার কবিতা ও গানের প্রকৃতি প্রায় এক ও অভিন্ন। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো কবির গীতিকবিতাগুলি ভাবঘন ও সুরসমৃদ্ধ। আধুনিকযুগের বাংলা কাব্যে যে গীতিকবিতার প্রাধান্য তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। এই বিকাশ যে শুধু ভাবের দিক হইতে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নহে, ভাষা ও ছন্দেও সে গীতিগৌরব উজ্জ্বল। কবি-কল্পনার অপূর্ব গীতিপ্রবণতা কাব্যের বাক্‌ভঙ্গিতে স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। একটি সুকোমল শ্রী ও নমনীয়তা এবং সঙ্গীতরাগ কাব্যের ভাষা ও ছন্দকে এক অনির্বচনীয় রসদীপ্তিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

লিরিক কবিতায় ভাবের সহিত ভাষা ও ছন্দের একটি সূক্ষ্ম ও সুকুমার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ভাষার অর্থের ব্যঞ্জনা ও অলংকারের দীপ্তি ও ছন্দের সুরঝংকার মিলিয়া ভাবের রসবিগ্রহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ভাব ও সুরের এই সঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে ব্যাপক ও গভীর বলিয়া তার রোমাণ্টিক আর্ট সার্থক হইয়াছে। জগত ও জীবনের বৈচিত্র্যের মূলে ভাব ও কল্পনার যে সঙ্গতি মিলে কবি বিশ্বাসী তাহাই তার লিরিক আর্টের সুরসঙ্গতির মুখ্য প্রেরণা। জীবনের ঐক্যে মিলে যে কবির বিশ্বাস সুদৃঢ় তার কাব্যের ভাব ভাষা ও ছন্দে

মিলসঙ্গতি গভীর হইয়াই দেখা দেয় : তার কাব্যশিল্প সেই বিশ্বাসে সঞ্জীবিত ও সমুজ্জ্বল। তবু চেষ্টা করিয়া সচেতন সজাগ থাকিয়াই কবি রচনার কারিগরি আয়ত্ত করিয়াছেন : যত্ন ও সাধনার ফলেই রবীন্দ্রনাথ লিপিকুশলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। তার কবিতায় সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের লীলায়িত ভঙ্গিমা থাকিলেও সুকুমার শিল্পবোধ কবির সদা জাগ্রত ও সূক্ষ্ম ছিল। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সরসতা ও সজীবতার অভাব কোথাও নাই : এইরূপ সর্বব্যাপী রসনিবিড়তা ও সরস অনুভূতির সমৃদ্ধি বাংলার আধুনিক রোমাণ্টিক কাব্যে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। রবীন্দ্রনাথের রসচেতনা ও শিল্পবোধ প্রবল ও জাগ্রত ছিল, বলিয়া তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে ভাব অথবা ভাষা কোনটারই অসংযম নাই। তবে অলংকারের দিকে কবির একটা ঝোঁক ছিল : কামনা দিয়া জীবন ও জগতকে ও অলংকার দিয়া ভাষাকে ভূষিত ভাস্বর মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার প্রয়াস রোমাণ্টিক কবিদের স্বাভাবিক ও প্রবল। মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ কল্পনা ও রচনায় সংযম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন যদিও অস্পষ্টতা ও আতিশয্য কবির বিপুল কাব্যসাহিত্যে স্থানে স্থানে মিলিবে। অলংকরণ ও কারুকার্যের ত্রুটী স্বীকার করিয়াও রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের অপূর্বতা মানিতে হয়। তার কৃতিত্ব ভাবে নয় আর্টে। ভাব ও দার্শনিকতায় মৌলিকতা রবীন্দ্রনাথের খুব কম, তবে

লিপিকুশলতা ও শিল্পরচনায় কবির মৌলিকতা ও সরসতা আধুনিক বাংলার কাব্যে তার শ্রেষ্ঠ অবদান। রোমাণ্টিক কাব্যে এমন লিরিক কারিগরি আধুনিক যুগে আর কোনো বাঙালী ও ভারতীয় কবি দেখাইতে পারেন নাই; বিশ্বসাহিত্যেও এইরূপ দক্ষতা দুর্লভ : রেণেসাঁসের পরবর্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি রচিত বিশ্বকাব্য সাহিত্যে কল্পনার এমন বিপুলতা ও বৈচিত্র্য রচনার এমন কুশলতা ও কারিগরি খুব কমই পাওয়া যাইবে। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দান লিরিক সুষমাসমৃদ্ধ তাব রোমাণ্টিক আর্ট : তার কল্পনা ও রচনা বিশ্বসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে অলংকারের ঐশ্বর্য সমারোহ রহিয়াছে। কালিদাসের কাব্যের মতো তার কাব্যেও ভাবের সংযম ও আভিজাত্য বর্তমান। শেলী কীটস্ প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের রচনায় এই সংযম পাওয়া যাইবে না। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য কাব্যে বেশী না থাকার কারণ 'রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন অনুভূতিকে তাহার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখেন নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন।'—**সুবোধ সেনগুপ্ত**। আবার কল্পনার ব্যাপকতা তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তাপ ও উষ্ণতা কমাইয়া দিয়া তার কাব্যে আনিয়াছে এক বিষণ্ণ নির্লিপ্তির করুণ বৈরাগ্য। অলংকরণের দিকে ভাষা সাজাইবার একটি প্রবল ঝোঁক কবির

আছে ঃ ভাবের সংযম অনুভূতির আভিজাত্য থাকিলেও রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার বাহুল্য ও অতিভাষণ আছে ; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, মদনভস্মের পর, সাজাহান, তপোভঙ্গ, সাবিত্রী, বর্ষশেষ কবিতাগুলি ভাষার অশান্ত আতিশয্য ও অলংকারের উন্মদ দীপ্তি বহন করে। ডক্টর টম্পসন্ কবির এই ভূষণবিলাস লক্ষ্য করিয়াছেন। "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অলংকার বাহুল্য স্বীকার্য।"—সুবোধ সেনগুপ্ত। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আধুনিক ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রভাবের ফল ঃ রোমান্টিক আর্ট একদিকে কল্পনাবিলাসী অন্যদিকে অলংকারবিলাসী ; ভাব ও ভাষার এই বিলাস রোমান্টিক কাব্যের প্রধান গৌরব ও চরম দুর্বলতা ঃ ইহা বাস্তব জীবন হইতে দূরে থাকিয়া ভাবলোকের মধুর মোহময় স্বপ্ন রচনা করে আর এই ব্যবধানই ইহাকে দুর্বল রুগ্ন করিয়া তোলে। সুবোধ সেনগুপ্ত যে বলিয়াছেন 'কোন কোন রোমান্টিক কবিতায় অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশের যে ক্ষমতার পরিচয় পাই তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাই' তাহা ঠিক নহে। কেননা এমন ক্ষুদ্র গীতি কবিতা কবি লিখিয়াছেন যাহাতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। কবির গানগুলি সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর অনুভূতি বিচিত্র সুরে ছন্দে প্রকাশ করে। গানগুলি ছাড়া এমন ছোট কবিতা আছে যাহাতে কবির কারিগরি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,

যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলোনা কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব করো যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

—জন্মদিনে

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধ গীতি, ভ্রষ্ট নীড়, পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্ক পত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে; কভু আম্র মুকুলের গন্ধেভরা
পেয়েছি আহ্বান বাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর;
অশোকের মঞ্জরি সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর স্থর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের—কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,

পক্ষ মোর করেছে অক্ষম ; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এজন্মের অধিদেবতারে।

—যাবার সময় হল বিহঙ্গের

সর্বতোভাবে গীতিকবি হইলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প ব্যঙ্গ কবিতাকে উপেক্ষা করে নাই। সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অসঙ্গতি আতিশয্য অনাচার অবিচার কবির হাস্যকৌতুকবোধ জাগ্রত করিয়াছে। তার ব্যঙ্গ কবিতায় আক্রোশ ও আক্রমণ কোথাও নাই ; বাঙালীর সাধারণ সামাজিক জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের বিভিন্ন অসামঞ্জস্যকে উপহাস করিলেও রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবোধ ও সহানুভূতি কোথাও মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ খর্ব হইতে দেয় নাই ; মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করিলেও কবি কখনো মানুষকে হীন করেন নাই। তাছাড়া কবির লিরিক আর্ট বিদ্রূপব্যঙ্গের তীব্র তীক্ষ্ম জ্বালাকে অনেকটা মধুর মোলায়েম করিয়া তুলিয়াছে : গীতিকাব্যের মেদুর কোমলতা কবির উপহাসকেও কমনীয় ও মসৃণ করিয়া দিয়াছে ; লিরিক সুষমা তার ব্যঙ্গ কাব্যকে অতি স্পষ্ট বাস্তব জীবনের রূঢ় রুক্ষতাকে কোমল করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ উপহাস মৃদু আঘাতে আমাদের সচকিত করিয়া তোলে :

উপহাসের যে পাত্র তার পক্ষেও কবির সহিত অট্টহাস্যে যোগ দিবার কোনো অসুবিধা হয় না। কবির ব্যঙ্গকবিতাও গীতি কাব্যের ভাবমাধুর্যে ও সঙ্গীতসুষমায় কোমল ও কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে আগাগোড়া এই বিদ্রূপের সুরটি অব্যাহত রহিয়াছে; লিরিক সুষমায় সমৃদ্ধ বলিয়া সমগ্র কাব্যসাহিত্যে ব্যঙ্গ কবিতাগুলি সঙ্গতি সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয় না: রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ধারায় এই হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল কবিতাগুলিও খাপ খাইয়া গিয়াছে। কবির রোমাণ্টিক কল্পনা ও লিরিক আর্ট তার ব্যঙ্গকবিতাকে সর্বব্যাপী সরসতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, কবির প্রতি নিবেদন, ধর্মপ্রচার, নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ, হিং টিং ছট প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তব পরিবেশের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন: এই সকল কবিতায় কবি কল্পলোকের সুদূর শিখর হইতে পৃথিবীর মৃন্ময় বুকে নামিয়া আসিয়াছেন; সাধারণ জীবনের সহিত এখানে তার প্রত্যক্ষ যোগ কিছু ঘটিল।

আর এক ধরণের লঘু হালকা ভাবের কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিতে শুরু করেন ক্ষণিকা কাব্যে: এই কবিতাগুলিতে বিদ্রূপের উপহাস নাই; ইহারা অকারণ পুলকে চপল দিনের আলোকে উজ্জ্বল ক্ষণিকের গান: ইহারা 'নদীজলে পড়া আলোর মতন' ঝলকে ঝলকে ছুটিয়া যায়; ক্ষণিক আনন্দে ইহারা মশগুল 'ছুঁয়ে

থেকে তু'লে শিশির যেমন শিরীষফুলের অলকে'। এই কবিতাগুলি নিবিড় আনন্দানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সরস অভিব্যক্তি। জীবনের গভীর কথা জটিল সমস্যাগুলিকে একপাশে সরাইয়া দিয়া প্রচলিত জীবনযাত্রা হইতে দূরে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের খেয়ালখুশী মতো কল্পনা করা ও কথা বলার আনন্দে কবিতাগুলি সরস ও সতেজ। গুরুগম্ভীর বিষয়কে হালকা করিয়া দিয়া খুশী হইবার নেশায় কবি মাতাল: 'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে' কবির সাহস আজ নাই। উদার চিত্তে কবি সকল বিধিবিধান ছাড়াইয়া চলিয়াছেন: আজ তাহার দুয়ার মুক্ত পাইয়া সাধুবুদ্ধি বহির্গত হইয়াছে; ষত্ব ণত্ব উড়াইয়া দিয়া কবির বাণী অকুণ্ঠ অকৃপণ অজস্রতায় চটুল চপল নৃত্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। ক্ষণিকার কবিতাগুলি লৌকিক ছন্দে রচিত বলিয়া ইহাদের অন্তর্লীন চপল ভাবগুলি লঘু লাস্যে চারিদিকে যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। ভাবানুভূতি ছন্দের হালকা সুরে যেন ঝিকমিক করিয়া মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত কাব্য প্রহাসিণী, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, ছড়া, ক্ষণিকার সুরভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছে। তবে এই কাব্যগুলিতে ক্ষণিকার সতেজ উচ্ছল সরসতা আর নাই; অকুণ্ঠ উচ্ছসিত প্রাণপ্রাচুর্য্য এখানে অনুভব করি না। ছড়ার কবিতাগুলি হেঁয়ালীর অস্পষ্ট ইঙ্গিতে রূপকথার রহস্যে রোমাঞ্চিত। শ্রাদ্ধ, মামলা প্রভৃতি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই।

পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এতো বকুল ফোটে, গেয়ে মরে কোকিল পাখী,
লতাপাতার অন্তরালে বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাপার শাখে চাঁদের আলো সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে ?
এসব যারা বোঝে তারা পঞ্চাশতের অনেক নিচে।

—শাস্ত্র, **ক্ষণিকা**

তোমার তরে সবাই মোরে করচে দোষী, হে প্রেয়সী।
বলচে কবি তোমার ছবি আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাইছে নীতি তোমার কানে ;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে উচ্চ কথা।

—ক্ষতিপূরণ, **ক্ষণিকা**

অল্পেতে খুশী হবে দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই চাই ভাজা ভেটকি।
আনবে কট্‌কি জুতো মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুঁড়ি থেকে এনো কই জিয়ানো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি॥
 চিনেবাজারের থেকে এনো তো করমচা,
 কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
 না হয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি॥

মনে রেখো বড়ো মাত্রপ করা চাই আয়োজন ;
কলেবর খাটো নয়, তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কী॥

—দামোদর শেঠ, **খাপছাড়া**

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনায় যেমন একটি ক্রমিক ব্যাপকতা ও প্রসারতা লক্ষ্য করি, তার ছন্দ প্রয়োগেও তেমনি একটি ক্রমবিকাশ দেখা যায়ঃ প্রচলিত বাংলা ছন্দ সম্পর্কে প্রথম হইতেই কবির অতৃপ্তি ও অভিযোগ ছিল ; যৌগিকরীতির অপূর্ণতা ও কৃত্রিমতা কবিকে পীড়িত করিয়াছিল বলিয়া কাব্যরচনার আদিযুগ হইতে কবির প্রয়াস ছিল প্রচলিত ছন্দকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন ছন্দোরীতি উদ্ভাবনের। কাব্য-রচনার আদিযুগে (১৮৭৪—৮১) শৈশবসঙ্গীত ও বনফুল কাব্যে অসন্তোষ দেখা দিলেও বাংলা ছন্দকে কবি মানিয়া লইয়াছেন ; পরবর্তী যুগে (১৮৮১—৮৬) সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া কড়ি ও কোমল কাব্যে কবির 'এই ব্যাকুলতা সর্বপ্রথমে ছন্দোমুক্তির পথে কতকটা অগ্রসর হয়, ; এই 'সময়টাকেও ছন্দব্যাকুলতা ও নিয়মভাঙার যুগ বলে অভিহিত করতে পারি'। এই যুগের কাব্যে প্রচলিত ছন্দোরীতিকে অস্বীকার করিলেও কবি নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ; তখন কাব্যের ছন্দ হইল ভাঙা ভাঙা উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু কবির ছন্দোমুক্তি লাভের চেষ্টার বিরাম ছিলনা : 'অবশেষে

মানসীর যুগে (১৮৮৭—৯০) যখন ছন্দকে ধ্বনির কালব্যাপ্তিগত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার নূতন রীতি উদ্ভাবিত হল, তখনই ওই অবিশ্রান্ত সন্ধানের কতকটা তৃপ্তি ঘটল।' প্রাক্-মানসী যুগের রচনায় শব্দমধ্যবর্তী যুক্তাক্ষরের বিরলতা লক্ষ্য করা যায়ঃ কবি অনুভব করিয়াছিলেন ব্যঞ্জন-সংঘাত ঘটিলে ছন্দের সহজ ধ্বনিপ্রবাহ বাধা পায়; তাই কবি প্রথম বয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের ব্যবহার বেশী করেন নাই। তবে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে যুক্তবর্ণকে বাদ দিলে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ একেবারেই দুর্বল বৈচিত্র্যহীন ও নিস্তরঙ্গ হইয়া পড়ে। ছন্দে ধ্বনিব এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা কবির মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তার পরিচয় মানসীর পূর্বে রচিত কাব্যগুলিতে পাই। 'কিন্তু মানসী রচনার সময়ে যখন তিনি ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যুক্তবর্ণ ব্যবহারের জাদুমন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তবর্ণের পর্যাপ্ত প্রয়োগের দ্বারা তিনি যে ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। —**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**।

অক্ষর হিসাব করিয়া ছন্দরচনার আক্ষরিক রীতি নাকি ভারতচন্দ্র প্রবর্তন করেন। আধুনিক যুগের কবিরা এই রীতিই মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন ছন্দ নির্ভর করে অক্ষরের ধ্বনির কালপরিমাণের উপর, অক্ষর সংখ্যার উপর নয়। তাই অক্ষরগণনার ভ্রান্ত প্রণালী ত্যাগ করিয়া কবি

ধ্বনিগত কালপরিমাণের উপর ছন্দকে গড়িয়া তুলিলেন। কিন্তু কবি বুঝিলেন বাংলা ছন্দে সংস্কৃতছন্দের ধ্বনিকাল পরিমিতির নিয়মটি খাটিবেনা; সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে স্বরবর্ণের সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ আছে, কিন্তু বাংলায় তাহা নাই। বাংলায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় নাই; শুধু হ্রস্বস্বরের ছন্দ একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠে। 'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন বাংলায় কার্যত দীর্ঘস্বর নেই বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি আছে: আর এই যুগ্মধ্বনিকে ছন্দের প্রয়োজনে অনায়াসেই বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রসারিত করে দীর্ঘতা দান করা যায়। এভাবে দীর্ঘস্বরের অভাব সত্বেও যুগ্মধ্বনির সাহায্যে বাংলা ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে তোলা সম্ভবপর হল।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**। কবি বুঝিতে পারিলেন যে-যুক্তবর্ণ তাব প্রথম জীবনের রচনায় ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহকে বাধা দিয়াছিল, মানসী কাব্যে সেই যুক্তবর্ণই ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত করিয়া তুলিবার পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠিল। ধ্বনিমাত্রাকে ভিত্তি করিয়া মাত্রিক পর্ব রচনার ছন্দোরীতিকে প্রবোধ সেন নাম দিয়াছেন মাত্রাবৃত্ত। তিনি উদাহরণ দিয়াছেন এই ছন্দেরচিত প্রথম কবিতাটি: ১৮৮৭ তে লিখিত—ভুলভাঙা:

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর।**

—**মানসী**

'ওই বন্ধন কথাটিই সর্বপ্রথমে বাংলাছন্দে অক্ষরগণনার বন্ধন-পাশ ছিন্ন করেছে।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।**

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। গীতগোবিন্দের পদগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্তের পার্থক্য এই যে প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি ও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু বাংলা মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা স্বীকৃত হয়না। 'এই দীর্ঘস্বরের অভাবটা বাংলা ছন্দের পক্ষে যে ভালো হয়েছে তা নয়; বরং দীর্ঘস্বরের প্রভাবে প্রাচীন রীতির মাত্রাবৃত্তে যে একটা ধ্বনিগত উদাত্ত গাম্ভীর্যের বিস্তার ঘটে, বাংলা মাত্রাবৃত্ত এই গাম্ভীর্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু উপায় নেই। বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ থেকেই যখন দীর্ঘস্বরের বিলোপ ঘটেছে, তখন বাংলা ছন্দে তাকে স্বীকার করা সম্ভব নয়।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।**

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিবিস্তারের যে মাধুর্য নিহিত আছে গীতি কাব্যের পক্ষে তাহা অনুকূল। এই বিস্তারপ্রবণতা ছাড়া বাংলা উচ্চারণ রীতির আর একটি প্রধান বিশেষত্ব হইল ঝোঁক বা প্রস্বর। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিবিস্তারের আড়ালে এই ঝোঁকটি গোপন থাকিয়া যায়। বাংলা কাব্যের যে ছন্দে ঝোঁকের প্রাধান্য তাহা লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বলা যায়; কারণ পল্লী গানেগীতিকায় ছড়ায় কথায় বাংলার এই স্বাভাবিক

স্বকীয় ছন্দের প্রয়োগ দেখি। রামপ্রসাদের গানে এই ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনার আদিযুগ হইতেই এই ছন্দের প্রয়োগ স্বরু করিয়াছেন: বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রভাত সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া কড়ি ও কোমলের (১৮৮৬) যুগ পর্য্যন্ত অব্যাহত এই লৌকিক ছন্দের ব্যবহার চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছেন বাংলা প্রাকৃত ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলা ছন্দ; প্রবোধ সেন ইহাকে বলেন স্বরবৃত্ত বা প্রাস্বরিক ছন্দ। বারো বছর পরে কল্পনা কাব্যের হতভাগ্যের গান (১৮৯৭) কবি রচনা করিলেন ছড়ার ছন্দে; কথাকাব্যের (১৮৯৯) তিনটি কবিতায় এই লৌকিক ছন্দ দেখা গেল; 'কিন্তু ক্ষণিকার যুগ (১৯০০) থেকেই তিনি নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়হস্তে এ ছন্দ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন'।—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**। ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা প্রাকৃত ছন্দে লেখা। 'বাংলা সাহিত্যে ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে মানসী কাব্যের ন্যায় এই ক্ষণিকা কাব্যখানিও একটি নব যুগের সূচনা করেছে।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**। তবে উচ্চাঙ্গের ভাব লইয়া প্রাকৃত ছন্দে কবি তখনো কবিতা লিখেন নাই। শিশু (১৯০৩) কাব্যে প্রাকৃত ছন্দ শক্তিশালী ও সুগঠিত হইয়াছে। এই সময়ে রচিত উৎসর্গ (১৯০৩—৪) কাব্যে 'রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে প্রাকৃত ছন্দকে খুব উচ্চাঙ্গের কবিতার বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন।' 'তারপর খেয়ার সময় থেকেই

(১৯০৫—৬) এ ছন্দ রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে ; ওই কাব্যেই দেখি ও-ছন্দ প্রয়োগের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত, তার প্রকাশভঙ্গি হয়েছে অভিনব এবং তার ক্ষমতা সম্বন্ধে কবির চিত্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।**

আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে ছিল মনে,
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।

—ক্ষতিপূরণ, **ক্ষণিকা**

মোর ভালে ঐ কোমলহস্ত
এনে দেয় গো সূর্য্য-অস্ত
এনে দেয় গো কাজের অবসান।
সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।

—**উৎসর্গ**

তীব্রতড়িৎ হাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে,
তোমার ঘরে ঢুকি
জগৎ যদি এক নিমেষে শক্তিমূর্তি ধরে
দাঁড়ায় মুখোমুখি—

কোথায় থাকে আধেক ঢাকা অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপন মাখা আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

—অনাহত, খেয়া।

'মাত্রাবৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্ত রীতি ও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই দান। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ ছন্দোরীতিটি বাংলায় ছিল না, একথা সত্য নয়। বস্তুত এরীতির ছন্দ আমাদের পল্লীসঙ্গীতে ছেলেভুলানো ছড়ায় কবির গানে বাউলের গানে মেয়েলি ব্রতকথায়, এক কথায় আমাদের লোকসাহিত্যে বহুকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। এ ছন্দোরীতিটিই হচ্ছে বাংলা লোকসাহিত্যের প্রধান বাহণ। এটিকে লৌকিক ছন্দ নাম দিলে অন্যায় হয় না।'—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রাথ**। বৈষ্ণব পদাবলীতে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের রচনায় ঈশ্বরগুপ্ত মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রভৃতি উনবিংশ শতকের কবিদের কাব্যে লৌকিক ছন্দের প্রয়োগ দেখি। বলাকা কাব্যে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাকে মুক্তক ছন্দ বলে। এই প্রবহমান ছন্দে মিল বা অন্ত্যানু-প্রাস আছে, অথচ পংক্তির নির্দিষ্ট পর্বসংখ্যা নাই ঃ এই স্বাধীনতা মুক্তক ছন্দের বৈশিষ্ট্য। পলাতকাকাব্য ও মুক্তকছন্দে রচিত ঃ তবে প্রবোধ সেন বলেন বলাকার ছন্দ যৌগিক মুক্তক এবং পলাতকার ছন্দ স্বরবৃত্ত মুক্তক। বলাকায় জীবনের গতিময়তার

সুস্পষ্ট অনুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ কবি শুধু গতিকেই স্বীকার করেন না, জীবনের স্থিতিকেও মানিয়া লইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন ; অজিত কুমার চক্রবর্তীকে এক পত্রে কবি লিখিতেছেনঃ 'গতিতত্ত্ব যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্ব তেমনি সত্য এবং সেইজন্যই গতিকে আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি না।' সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ গতিবাদ প্রচার করেন ঃ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এই দার্শনিক গতিবাদ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। প্রভাত কুমার বলেন ঃ বের্গসঁর মতের মধ্যে যে ভাবুকতাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার ধ্বনি কবি মানসকে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বের্গসঁর মতকে দার্শনিক তত্ত্বরূপে গ্রহণ না করিয়াও অনুভূতির দ্বারা, মননের দ্বারা তাহার যে নির্গলিত রসটুকু কবি বুঝিয়া লইয়াছিলেন তাহাই তাহার কাব্য উপকরণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কবি যেখানে কাব্য ছাড়িয়া তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন সেখানে বের্গসঁর মতবাদকে স্বীকার করেন নাই।—**রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড**। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তীব্রতরো ও ব্যাপকতরো হইয়া উঠে ঃ বলাকা কাব্যের ভাবে ও ছন্দে যেন জাতীর জীবনের মুক্তিপ্রয়াস ও গতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জীবনের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গদ্যকবিতা লিখেন ঃ পুনশ্চ (১৯৩২) হইতে গদ্যকবিতার যুগ শুরু হইল। এই সময়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিবেশে কবির কৌতূহল বাড়িয়া যায় ঃ মিলহীন

বাস্তব জীবনের অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য কবি আর উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ; ইহার ভিতর কবি মাধুর্যের ও সৌন্দর্যের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। গদ্যের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ভাবের ছন্দ বা ভাবচ্ছন্দ ঃ ভাবের অনুবর্তন করিয়া কবিতাগুলি আবৃত্তি করিলে একটি ধ্বনি ঝংকার কানে বাজে ; গদ্যকবিতায় সুস্পষ্ট ছন্দ নাই বটে, কিন্তু ছন্দের আভাস আছে। গদ্যকবিতার ধ্বনিবিন্যাস পদ্যের মতো সুপরিমিত নয় ; ইহা একেবারে অপরিমিত বা উচ্ছৃঙ্খলও নয়। পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না থাকিলেও গদ্যকবিতায় 'পদ্যের রং' ছন্দের আভাস রহিয়াছে। 'ওখানেই গদ্যকবিতার ধ্বনিসৌষ্ঠবগত সার্থকতা।' গদ্যকবিতায় গদ্যের পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতা নাই, আবার পদ্যকবিতার সুনির্দিষ্ট ছন্দের সুদৃঢ় বন্ধনও নাই। গদ্যের মতো গদ্যকবিতা অর্থগত বাক্‌পর্বে বিভক্ত ঃ অর্থানুসারী বলিয়া এই বাকপর্ব ভাবেরই পর্ব। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার ছন্দকে বলেন ভাবচ্ছন্দ। গদ্যকে কবি 'পদ্যের প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত এবং একটুখানি ছন্দের রঙীন আভায় মাধুর্যময়' করিয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যকে ছন্দের আধিপত্য হইতে ক্রমশ মুক্তি দিয়াছেন। গদ্যকবিতার ভাষা ঠিক আটপৌরে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা নয় ; ইহাতে সৌন্দর্য ও কবিত্ব কল্পনা ও অলংকার কিছু আছে।

বাংলাদেশে ছন্দের বাঁধনকে শিথিল করিয়া ভাবকে মুক্তি দিবার প্রথম প্রয়াস করেন মাইকেল। পয়ার ছন্দকে প্রবহমান করিয়া

মধুসূদন অমিত্রছন্দের প্রবর্তন করেন। এই প্রবহমান ছন্দের প্রতিপংক্তির নির্দিষ্ট মাত্রা সংখ্যার বন্ধনকেও অস্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে আরো মুক্ত করিলেন ; ইহাব প্রমাণ মুক্তক ছন্দে রচিত বলাকা হইতে পরিশেষ পর্যন্ত কাব্যের কবিতাগুলিতে পাই ; পরিশেষ কাব্যে মুক্তক ছন্দ পূর্ণতা লাভ করিল। 'কিন্তু মুক্তক ছন্দও ছন্দ ; সুতরাং তাতেও কবিকে ধ্বনিবিন্যাসগত বিধিবিধান কিছু না কিছু মেনে চলতে হয়। এইটুকু বন্ধনকেও অস্বীকার করে কাব্যরস অব্যাহত বাখা যায় কিনা, সে পবীক্ষা কবাব জন্যে কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই দেখতে পাচ্ছি পুনশ্চ কাব্যে (১৯৩২) ধ্বনিগত ছন্দের আভাসমাত্র রেখে তিনি অসংকুচিত গদ্যরীতির রচনাতেই কাব্যরস সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং পত্রপুট গ্রন্থে (১৯৩৫) এই ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতাব পূর্ণবিকাশ ঘটেছে।'— **ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**। এই ছন্দমুক্তিসাধনাব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধ সেন বলেন ঃ তার কবি জীবনে ছন্দোবিবর্তনের ক্রমপবিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে, বলাকা ও পলাতকা থেকে পরিশেষ এবং পরিশেষ থেকে পুনশ্চ গ্রন্থে কি ভাবে তিনি কাব্যকে ছন্দের আধিপত্য থেকে ক্রমশ মুক্তি দিয়েছেন সেদিকে লক্ষ্য করলে, স্বীকার কবতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে ছন্দোমুক্তিসাধনার ফলেই গদ্যকবিতার আবির্ভাব হয়েছে। মুক্তক ছন্দে যে সাধনার সূচনা হয়েছিল তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে এই গদ্যকবিতায়।—**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**।

দুঃখেরে দেখেচি নিত্য পাপেরে দেখেছি নানা ছলে,
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি ;
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিবাট স্বরূপ!
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে ;
তোবে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।

—বলাকা

বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলা ক্ষেত্রে মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।

*   *   *   *

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলেস্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
—পৃথিবী, **পত্রপুট**

মাইকেলের কাব্যে যে আধুনিক নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ দেখিয়াছি তার একটি যুগের বিবর্তন ও পরিসমাপ্তির ইতিহাস রবীন্দ্রকাব্যে পাইলাম। কলিকাতা বহিরাবরণে পল্লীসভ্যতাব প্রভাবমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মহানগরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে ঃ শিক্ষিত বাঙালীরা মুক্তি চিন্তায় পুরাতন সংস্কার সম্পূর্ণ বর্জন না করিতে পারিলেও ভাবানুভূতিতে ও রুচিতে অনেকটা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় হইয়া উঠিল; সমাজ ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কাব জাগ্রত ও জীবন্ত থাকিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিলেও দেশপ্রীতির এক গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে; জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভের প্রয়াস আমাদের মহানগরীগুলির শিক্ষিত সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নাগরিক সংস্কৃতিতে একদিকে আছে সামনে চলিবার বৈপ্লবিক আগ্রহ, অন্যদিকে আছে পুরাতনকে আঁকড়িয়া

থাকিবার সংস্কার ; নগরের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি মোহ থাকিলেও আধুনিক নাগরিক 'পল্লবঘন আম্রকানন ছোটো ছোটো গ্রামগুলি'র নির্জন নির্ভৃত শান্তশীতল স্নেহস্পর্শের জন্য আকুল হইয়া উঠে ; বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সকল সুবিধা সুযোগ ভোগ করিতে ব্যগ্র হইয়াও বিস্মৃত অতীত যুগের কাল্পনিক সুখসমৃদ্ধি শান্তিসন্তোষের কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ বিবাগী হইয়া উঠে ; বিজ্ঞান চর্চা করিলেও যাদুবিদ্যা মাদুলীর মোহ ও মানত করিবার অভ্যাস আমরা একেবারে ছাড়িতে পারি নাই ; ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর তত্ত্বকথা আওড়াইয়া সংকীর্ণ স্বার্থপর হইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য ইন্দ্রিয় ভোগে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিতে আমাদের দ্বিধা নাই ঃ জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াও অর্থলাভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তি তৃপ্ত করিবার জন্য এমন কোনো অন্যায় হীন জঘন্য কাজ নাই যাহা করিতে আমরা পরান্মুখ ; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে করিতে আমরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবও পোষণ করি ; সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার গৌরব প্রচার করিলেও মানুষের সমাজ শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধে জর্জরিত ; সাম্রাজ্যবাদ পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে মোটেই কুণ্ঠিত নয় ; বিশ্বযুদ্ধ করিয়া আমরা মানবতা ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধনের আদর্শ প্রচার করিয়াও ইহাকে অস্বীকার করি ; মানব সভ্যতার অভূতপূর্ব

সৃষ্টিপ্রতিভার বিকাশ হইলেও মানুষ আজ আপনাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত ; আমরা পরিবর্তন ও গতিকে জীবনেব প্রকৃতি বলিয়া মানিলেও পুরাতন প্রচলিত ধারাকে আকড়িয়া ধরিয়া স্থিতিশীল স্থবির হইয়া উঠি। আমরা একই সময়ে বিপরীত মনোভাব ও পরস্পর-বিরোধী আদর্শ পোষণ করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত ও আত্মবিরোধী হইয়া পড়ি।

আধুনিক জীবন পরিবেশের এই বিবোধ ও ব্যবধান দ্বিধা ও দ্বৈত মনোভাব ববীন্দ্রকাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মুখর মহানগরীর কর্মকলরব কবিকল্পনাকে পল্লীপ্রকৃতির নির্জন পথেঘাটে মাঠেখেতে উধাও করিয়া দেয় ; ছায়াস্নিনিবিড় পল্লীকুঠিরপ্রাঙ্গনের মাতৃস্পর্শ লাভের জন্য কবির প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর নিস্পিষ্ট আধুনিক নগরের যান্ত্রিক নব সভ্যতার ধূলিধূসর বস্তুবৈভব বিচলিত ব্যথিত কবিকে সুদূব অতীতের আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ আরণ্যক সভ্যতার যুগে তপোবনের শান্তনির্জন পরিবেশ অনুভব করিবার জন্য আকুল করিয়া তোলে ; বর্তমান কবিকে সময় সময় বিচলিত ও ব্যথিত করে বলিয়াই কবির মন বিগত প্রাচীন সভ্যতার কাল্পনিক সুখসম্পদ শান্তি সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উন্মনা হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রকৃতির জীবনমূলে গতির আস্বাদ লাভ করিলেও ধ্রুবস্থির অপরিবর্তনীয় এক চিরন্তন ভাবসত্বার কল্পনা করিয়া তবে

কবি আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছেন; গতিকে জীবনের প্রকৃতি বলিয়া বুঝিলেও স্থিতিকে আঁকড়িয়া থাকিবার আগ্রহে কবি বার বার পশ্চাতের পানে চাহিতেছেন। নিরুদ্দেশ যাত্রায় অকূল সাগরে সোনার তরী ভাসাইয়া কবি ফেনিল তরঙ্গের হিন্দোলে আন্দোলিত হইয়া সুদূর অস্তাচলের পানে চলিতে চান, আবার তীরের বন্ধনমোহ সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া একেবারে চলিয়া যাইতেও কবি পরান্মুখ; অসীম কবিকল্পনাকে উধাও উন্মনা করিয়া দেয়, সীমা কবির জীবনকে বাঁধিয়া রাখে; বহির্বিশ্বের শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ কবির বিধুর কল্পনাকে ভাবলোকের অবাধ উন্মুক্ত আকাশে মিস্টিক সৌন্দর্যের অভিসারে ঠেলিয়া দেয়; বাস্তব জীবনের রুক্ষ বন্ধুরতা কল্পলোকে আসিয়া মসৃণ মোলায়েম ও মধুর হইয়া উঠে। জীবন পরিবেশে যে বিভেদ বিরোধ সংগ্রাম সংঘাত রহিয়াছে কবির মানস-লোকে তাহা সীমা অসীমের বিরহমিলনের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অখণ্ড প্রেমের লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবনে সংগ্রাম ও বিরোধ থাকিলেও ভাবলোকে কল্পনা দিয়া কবি মানবজীবন ও বিশ্বজীবনের ঐক্য ও সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব বিরোধ বিভেদ ও বৈষম্য সকল মানুষের মনকে ও জীবনকে যে খণ্ডিত দ্বিধাগ্রস্ত বিরোধী ও বিদ্বেষী করিয়া তোলে স্বপ্নবিলাসী আদর্শবাদী কবি তাহা অস্বীকার না করিলেও উপেক্ষা করিয়া

গিয়াছেন ; গতি ও স্থিতি বিরোধ ও মিলন খণ্ড ও অখণ্ড অসামঞ্জস্য ও সঙ্গতি জীবনের এই দ্বৈতরূপের সহযোগিতায় কবির কাছে জীবন সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও মিল ও সঙ্গতি ঐক্য ও মিলনের কামনা কবিকে পাইয়া বসিয়াছে ; বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা তাহাকে মুগ্ধ করে বেশী, রোমান্টিক কবি জীবনকে দেখে না, সৃষ্টি করে ঃ কেননা সে মনে করে ঃ 'ঘটে যা তা সত্য নহে'।

জীবনের মূলে সঙ্গতি ও মিলের যে গভীব বিশ্বাস কবির ছিল এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বদেশে ও বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নৃশংস বর্বরতা মানুষের চরম লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাতিবৈষম্যের নিষ্ঠুরতা ও দুইটি বিশ্বযুদ্ধে সভ্যতার শোচনীয় সংকট দেখিয়া তাহা বাবে বারে আঘাত পাইয়াছিল, তবু একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। প্রাত্যহিক জীবনের অজস্র অসঙ্গতি অন্যায় বিভেদ ও বৈষম্য দেখিয়াও কবি মানবজীবনের দার্শনিক ঐক্যে বিশ্বাস হারান নাই। কল্পনা দিয়া যে ভাবৈক্য কবি অনুভব করেন আধুনিক যুগের জটিল সংঘাতসংকুল জীবনপরিবেশে তার সমর্থন পাওয়া যায় না ; জীবন হার মানিলেও কবির বিশ্বাস হার মানে না। কবি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে মনুষ্যত্ব কখনো পাশবতার নিকট পরাভূত হইতে পারে না ঃ যুদ্ধবিগ্রহ যাহাই ঘটুক না কেন সমবেত ভাবে মানবজাতি সভ্যতাকে বিকাশের পথে লইয়া

যাইবে ; আদর্শের জন্য দুঃসহ ত্যাগ ও দুঃখবরণ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ কখনো ব্যর্থ হয় না। এই উজ্জ্বল আশাবাদ রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন ও কাব্যকে সরস বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তবে এই আশার বাণী আমাদের চলার পথে প্রেরণা দিলেও আমাদের সমস্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে ; বিশ্বাস জাগাইলেও জটিল জীবন পরিস্থিতি কবির রোমান্টিক কল্পনাকে উপহাস করিয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের সহিত কাব্যের সম্পর্ক মাটিব সহিত আকাশের সম্পর্কের মতো সত্য হইলেও সুদূর।
পাশ্চাত্য ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মার্জিতরুচি নাগরিক বিদগ্ধ জনেরাই রবীন্দ্রকাব্যেব রোমান্টিক আর্ট মিষ্টিক কল্পনাবিলাস ও মানস সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা বুঝিতে পারে ; সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কবির কাব্য রস উপলব্ধি ও উপভোগ কবা খুবই কঠিন ; কারণ তাহাদের পরিচিত দৈনিক জীবনের সহিত ইহার যোগাযোগ এতো অস্পষ্ট ও রোমান্টিক কল্পনায় ব্যাপক ও বহস্যঘন হইয়া আছে যে রীতিমতো কাব্যের কালচার না করিলে ইহার মর্যাদা উপলব্ধি করা সম্ভবই নয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বিদগ্ধ জনের কবি, সাধারণ মানুষের নন ; যাহাদের মানসসংস্কৃতি ও রুচি অতিশয় পরিমার্জিত হয় নাই, দিন যাপনের বিচিত্র কর্ম ও চিন্তাভারে যারা বিভ্রান্ত ও বিব্রত নিতান্ত কাব্যরসিক না হইলে তারা রবীন্দ্রনাথের

গীতিকাব্যের রসমাধুর্য বিশেষ কিছুই উপভোগ করিতে পারিবে না। বৈষ্ণবকাব্য সংস্কৃত ও ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের প্রভাব সমৃদ্ধ রবীন্দ্রকাব্য উপভোগ করিতে হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয় থাকা দরকার: মহানগরীর শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের মার্জিত পরিশুদ্ধ রুচির সংকীর্ণ আভিজাত্য বোধ না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যের মহিমাও লিরিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; উন্নত ধরণের রসবোধ ও মানস সংস্কৃতি না থাকিলে কবির আর্টের গৌরব বোঝা যাইবে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত অভিজাত বিদগ্ধ সমাজের কবি; অজ্ঞ আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত অগণিত সাধারণ মানুষ তার কাব্যে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে।

তবু সাধারণ মানুষের প্রতি কবির সহানুভূতি আগাগোড়া তার কাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে। তার স্বদেশীগানে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে; এবার ফিরাও মোরে, দুর্ভাগা দেশ, এরা কাজ করে, ঐকতান প্রভৃতি কবিতায় কবির জনপ্রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তবে উপেক্ষিত দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের ধূলিধূসর জীবনপ্রাঙ্গনের বাহিরে থাকিয়াই কবি তার মানবপ্রীতি দূর হইতে অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অনাদৃত জীবনের শরীক হইয়া অন্তরঙ্গ হইতে পারেন নাই। কল্পলোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে আর্ত মানুষের ক্রন্দন শুনিয়া কবি মাঝে মাঝে অশ্রু-

বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখদুর্দশার অংশ গ্রহণ করিলে স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রীতি ও সহানুভূতি উৎসারিত হয় কবির তাহা ছিল না। পারিপার্শ্বিক জীবনের সহিত তার সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না; সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত কবির জীবনের ব্যবধান ছিল দুরতিক্রমণীয়ঃ জীবনযাত্রার সামাজিক সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বন্দী হইয়া কবি কল্পনা দিয়া তার প্রতিবেশী মানুষের প্রাঙ্গনের ধারে মাঝে মাঝে গিয়াছেন; কিন্তু 'ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।' প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য দুঃখদুর্দশায় পীড়িত যে সাধারণ মানুষ চিরকাল দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে তাহাদের আশা আনন্দহীন নিষ্ফল জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস কবির কাব্যে নাই। জন-সাধাবণের নিষ্পেষিত পাণ্ডুব বন্ধুর জীবনের বিচিত্র কর্ম ভার রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে দেখিয়াছেন; তার রোমান্টিক কাব্যের সুর সৌন্দর্য ও সঙ্গতির সহিত চারিদিকের জাগ্রত বিক্ষুব্ধ বাস্তব জীবনের মিল ছিল না: দূরে ছিলেন বলিয়া ইহার সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে সুরের এই অপূর্ণতার কথা জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তার কাব্য 'গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' শেষ জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া কবি উপেক্ষিত জনগণ সম্বন্ধে আরো সচেতন হইয়া উঠেন। তার শেষ বয়সের

কবিতাগুলি বাস্তবজীবনের জটিল সমস্যা আর উপেক্ষা করিতে পারে নাই : মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট দেখিয়া কবির গণচেতনা উদ্বুদ্ধ হইল। জীবনগোধূলিতে কবি অনাদৃত মানুষের কুটির প্রাঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্যছন্দ রচনার যুগ হইতে কবি ক্রমশ জীবনের বাস্তব পরিবেশের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন ; সাধারণ মানুষের পরিম্লান জীবনকে দেখিবার ব্যগ্রতা তাহার দেখা গেল। তবু তার সমগ্র কাব্যসাহিত্যে পৌঁছিল না 'বহুতর ডাক' ; তার আর্টে এই ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। অগণিত জনগণের জীবনেব সহিত কবির জীবনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না বলিয়া তিনি মনে করেন কৃত্রিম পণ্যে তার গানের পসরা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কবি সবিনয়ে এই নিন্দার কথা মানিয়া লইয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিতে কবিব প্রগতিশীল মনের পরিচয় মিলে : বিশ্বে মানুষের গণচেতনার ব্যাপৃতির সহিত কবির কল্পনা ও সহানুভূতি বিস্তার লাভ কবিয়া সহজ সাধারণ মানুষ ও মাটির কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা করিয়াছে ; ববীন্দ্রনাথেব রোমান্টিক আর্ট তার স্বাভাবিক দূরত্ব ও আত্ম-কেন্দ্রিকতা ছিন্ন করিয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মানুষের বাস্তবজীবনের সমস্যা ও সংঘাত সম্পর্কে সচেতন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে রচিত কবিতায় কবি যা বলিতেছেন তাহাতে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে কবি কল্পনা ঊনবিংশ

শতকের চরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া মধ্যবিংশ শতাব্দীর সামাজিক গণচেতনায় প্রসারিত হইল।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক ;
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয় ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।
এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যতো করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাওতো উদবারি।
সাহিত্যের ঐকতান—সঙ্গীতসভায়

এক তারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়---
মূক যারা দুঃখেসুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

—ঐকতান, জানুয়ারী, ১৯৪১

নজরুল

কবি নজরুলের কাব্যে দুইটী ভাবধারা ব্যক্ত হইয়াছে : একটি রুদ্রভৈরব উদাত্ত উদ্দাম বিদ্রোহীর উদ্বেল প্রাণোচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা আর একটি নরম কোমল সূক্ষ্ম সুকুমার নিবিড় প্রেমের আকুতি। একদিকে কবি দুর্ধর্ষ দুর্জয় সৈনিক বিপ্লবী, আর একদিকে তিনি স্বপ্নবিলাসী লাল শরাবে ভর-গেলাস পিয়াসী দরদী প্রেমিক দীওয়ানা বাউল। 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য!' কাব্যলোকে নজরুল চলিয়াছেন একহাতে বন্দুক ও আর হাতে বাঁশী লইয়া। তার কাব্যের জলসায় একদিকে শুনি উন্মাদ জঙ্গী দামামা, লড়াই-এর মত্ত ভেরী, ইনক্লাবের খুন-খোশী আহ্বান, আর একদিকে বাজে বেণুবীণার মধুর ঝংকার, শ্যামের বাঁশরী, বুলবুলির গুঞ্জনে মশগুল গুলবাগিচায় পান-বেহুঁশ শরাবখানার শাকীর কণ্ঠে হাফিজী গজল। নজরুলের কাব্যে শুনি ইস্রাফিলের শিঙ্গার সাথে অর্ফিয়াসের বাঁশরী। হাতিয়ারের ঝঞ্ঝনার সঙ্গে বীণার বেহাগ মূর্চ্ছনায় কবির কাব্য এক অভিনব ভাব বৈচিত্র্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। আনন্দ উদ্দীপনা, গতি অনুভূতি, সৃষ্টি ও ধ্বংশের যুগল ভাবোচ্ছ্বাস পাশাপাশি নজরুলের

কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাজি নজরুলের কবি-মানস একাধারে ভাবুক ও কর্মী, প্রেমিক ও শহীদ। ✓

বিংশ শতাব্দী হইল বিশ্ববিপ্লবের যুগ। ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। এশিয়ায় শুরু হইল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মুক্তির সংগ্রাম। প্রথম মহাযুদ্ধে সারা জগতে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের যে ভাবাদর্শ উৎসারিত হইল ভারতবর্ষও সে নবযুগের বাণীতে সাড়া দিয়াছিল। যুদ্ধের পর অর্থ-নৈতিক দুঃখদুর্দশায় ও রাজনৈতিক নবচেতনায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু তীব্রতরোই হইল না, ব্যাপকতরো ও হইল। জাতীয় মুক্তির লড়াই ইংরেজি শিক্ষালব্ধ রাজনৈতিক জাগৃতিতে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্তের সকরুণ অনুরোধ উপরোধে পর্যবসিত থাকিল না, এক বিরাট বিপুল বিপ্লবী রূপ ধারণ করিল: ধনী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মীদের সহিত মিলিত হইল কিসানমজদুর ছাত্রতরুণ কেরাণী শিক্ষক। ব্রিটিশ শাসকের কামানের গোলা ও বন্দুকের বারুদ জনগণের নব জাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনায় ধরাইয়া দিল আগুনঃ বোমা মানুষের মনকে ফাটাইয়া জাগাইয়া তুলিল। কংগ্রেস এ সংগ্রাম পরিচালিত করিল; দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে গান্ধীজী আসিয়া এই ব্যাপক গণ-উত্থানের নেতৃত্বভার নিলেন। ইহা ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের অগ্নিযুগ।

ইহারই প্রাণ চঞ্চল পটভূমিকায় নজরুলের আবির্ভাব। হাবিলদার কবি প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক হইয়া গিয়াছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে

বাগদাদ বসোরায়। মৃত্যুও ধ্বংস হিংসা ও বিদ্বেষের মাঝে আরব তুর্কী ও ইউরোপের নবজাগরণের ভোরের ভৈরবী তিনি শুনিয়া আসিলেন। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের ভিতবে ক্রমোদ্ভিন্ন নব জীবনের স্পন্দন বাঙালী কবির প্রাণে সাড়া জাগাইয়া দিল। নজরুলের প্রকৃতিতেও দুইটি ভাবানুভূতি জাগ্রত ছিল ঃ একদিকে দুর্দম বিদ্রোহীর আত্মবিস্মৃত সর্বস্বদানেব রুদ্র প্রেরণা অন্যদিকে রসনিবিড় প্রেমিকের রোমান্টিক কল্পনা। যুগেব আলোহাওয়া আগুন বোমা কবির ভাবে ভাষায় ছন্দে সুরে ছুঁয়াইয়া দিল আগুনের পবশমণি। বাঙালীর প্রাণে ইহা আনিয়া দিল নূতন শক্তি প্রেরণা, জীবনে দিল নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন বাঙালী কবিব লড়াইএর গানে হায়দরী হাঁক শুনিয়া মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক শহীদের দল সামনে চলিবার সাহস ও উৎসাহ পাইয়াছিল।

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণপ্রাতের তরুণদল চলরে চলরে চল।
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত; আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত বাধার বিন্ধ্যাচল। **চল, চল, চল**

অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম চলবে চল।
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর,
বাসি বসুধার নব অভিযান আজিকে তোর।

রাখ তৈয়ার হাথেলীতে হাতিয়ার জোয়ান,
হানরে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবান,
কোথায় হাতুড়ি, কোথা শাবল। —**অগ্রপথিক**

দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রে নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ,
কে আছো যোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ,
এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
—**কাণ্ডারী হুঁশিয়ার**

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর॥
ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধু পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যুগহন অন্ধ কূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে,
বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর। —**প্রলয়োল্লাস**

আরো বহু কবিতা ও গানে নবযুগের জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রাণচঞ্চল বাংলার মর্মবাণী ব্যক্ত হইয়াছে : ছাত্রদলের

গান, আমি গাই তারি গান, জীবন বন্দনা, ফরিয়াদ, সব্যসাচী, রক্তাম্বর ধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা ও গান নূতন ভারতের জাতীয় জাগরণের সঙ্গীত। সব্যসাচী কবিতায় কবি শুধু বাংলা ও ভারতেরই নয় সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামকেও অভিনন্দিত করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বা সম্পূর্ণ সার্থক ও সামগ্রিক ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে কবির বিদ্রোহী কবিতায়। সে যুগের বিপ্লবী বাংলার একখানি সুসম্পূর্ণ ভাব আলেখ্য বিদ্রোহী কবিতাটি ঃ ইহা নজরুলের ব্যক্তি-মানসেরই শুধু প্রকাশ নয়, আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী নির্ভীক বলিষ্ঠ বেগবান বিপুল জাতীয় চৈতন্যের ইহা অভিব্যক্তি ঃ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বন্দী বাংলার মুক্ত প্রাণ-নির্ঝর যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল নিজের উপলব্ধিই শুধু প্রকাশ করেন নাই, প্রকাশ করিয়াছেন সেদিনের সমগ্র দেশের জাতীয় অভিপ্রায়কে। কবির অগ্নি বীণায় বাজিয়া উঠিল মুক্তিকামী বাংলার বিপ্লবের বহ্নিরাগ।

বল বীর

বল উন্নত মম শির।

শির নেহারি তোমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রীর।

*　　*　　*　　*

আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস,

মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস।

*   *   *   *

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার !

*   *   *   *

আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সমুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি !
আমি নৃত্য চপল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি,
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল
আমি চপলা চপল হিন্দোল।

*   *   *   *

আমি তাই কবি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শক্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,

*   *   *   *

আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার,

আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ প্রচণ্ড।

* * * *

আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ,
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

—**বিদ্রোহী**

বিদ্রোহীর এই আত্মোপলব্ধিতে শুধু কবিব অন্তরের বাণীই হিন্দোলরাগে ঝংকৃত হয় নাই, ইহাতে সেদিনের বাংলার সমগ্র মর্মবাণীও উচ্চারিত হইয়াছিল। বন্ধনমুক্ত বাংলার সমগ্র বিপ্লবী কামনাব এক কেন্দ্রীভূত মহাপ্লাবন যেন কলকল্লোলে কবিতাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোড়িত আন্দোলিত হইয়া উঠে। বিদ্রোহী বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবিতা।

ঐতিহাসিক মূল্য বিদ্রোহী কবিতার একমাত্র বিশেষত্ব নয়। আগে কবিমনের যে দুইটি ভাবধারার কথা বলা হইয়াছে বিদ্রোহী কবিতায় তাহার পরিচয় পাই। জীবনের ভীম ভৈরব প্রকাশেই শুধু বিদ্রোহীর মন মাতিয়া উঠে না, প্রেম আনন্দ ব্যথা বেদনা আশা ভালোবাসা সৌন্দর্য মাধুর্যেও বিদ্রোহীর প্রাণ উচ্ছল উদ্বেল হইয়া উঠে।

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী তন্বীনয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্যি।

আমি উন্মান মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চিরগৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরমবেদনা, বিষ জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে
গতিফের।
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়েব ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন কন!
আমি চির-শিশু চিব-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার কাঁচলি-নিচোর!
আমি উত্তর বায়ু মলয় অনিল উদাস পুরবী হাওয়া,
আমি পথিক কবির গভীব রাগিনী বেণুবীণে গান গাওয়া!
আমি আকুল নিদাঘ তিয়াসা, আমি রৌদ্র রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়াছবি!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহাসিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম,
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্ব নিঝঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি,
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

—বিদ্রোহী

বিদ্রোহীর অগ্নিবীণায় বহ্নিরাগের সহিত বেদন বেহাগও বাজে। বাঙালীর নূতন জাতীয় জাগরণ সর্বব্যাপী ব্যাপক ও বিপুল : তার বিপ্লবী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জগতের সকল বৈচিত্র্যের সমাবেশ হইয়াছে : কুমারীর নবোদ্ভিন্ন প্রণয়ের সঙ্গে ষোড়শীর প্রেম, বিধবার ক্রন্দনশ্বাসের সহিত চপল মেয়ের ভালোবাসা, হুতাশীর হা-হুতাশ ও গৃহহারা পথিকের ব্যথা, অবমানিতের মরমবেদনা ও অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, শিশু ও কিশোর, উত্তর বায়ু ও মলয় অনিল, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ও ছল করে দেখা অনুখন এবং যৌবনভীতু পল্লীবালার কাঁচলি-নিচোর, রৌদ্র রুদ্র রবির সহিত শ্যামলিমা ছায়াছবি, নিদাঘ-তিয়াসা ও মরু নির্ঝর ঝর ঝর, অর্ফিয়াসের বাঁশীর সঙ্গে শ্যামের বাঁশরী তাহাদের স্বকীয় ও সম্মিলিত মাধুর্যে ব্যক্ত হইয়াছে। বিপ্লবীর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি শুধু যে ব্যাপক তাহাই নয়, একটি উদ্বেল প্রাণোচ্ছ্বাস তাহার সকল ভাব ও কল্পনাকে সাবলীল গতিচ্ছন্দে বেগবান করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্রোহীর হা-হুতাশ আছে, লাঞ্ছনা অপমান আছে, ব্যথা বেদনা আছে, কিন্তু তাহার অবসাদ নাই ক্লান্তি নাই নৈরাশ্য নাই। কারণ সে যে 'নৃত্যচপল ছন্দ' : 'আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।' কবিকল্পনার দ্বৈতরূপ আরো সুস্পষ্ট হইয়াছে নীচে উধৃত স্তবকে :

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি প্রাণখোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টিবৈরী মহাত্রাস,
আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস,
আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী।

* * *

আমি শ্রাবণ প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা।

—বিদ্রোহী

বিদ্রোহীর ঝঞ্ঝাগতি ও প্রলয় নৃত্য সেইদিন শান্ত হইবে—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত। —বিদ্রোহী

বিদ্রোহী কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার উদ্দাম উদ্দীপ্ত সুর ঝংকার। বিপ্লবীর আত্মোপলব্ধি বাংলা ভাষা ও ছন্দের এক গোপন শক্তি উৎসকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশের নূতন শব্দ সম্ভার ও সুর ঝংকার আবিষ্কার করিয়াছে। ভাব ও ছন্দ একাত্ম সহযোগে পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিতেছে। কবিতাটির ভাবানুভূতি ভাষা ও ছন্দের ধ্বনি সঙ্গীতে বিদ্রোহীর মর্মবাণী পাঠকের মনে সহজেই সঞ্চারিত

করিয়া দেয়। বিচিত্র সুরের অর্কেষ্ট্রা বিপ্লবী ভাবব্যঞ্জনাকে আমাদের সমগ্রচেতনায় একাগ্র উদ্দীপনার উল্লাস জাগাইয়া দেয়। বিদ্রোহী কবিতার সুব সমৃদ্ধি রচনার আভরণ অলংকারমাত্র নয়, ইহা ভাবানুভূতির অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক : উদাত্ত ছন্দ উৎসারিত হইয়াছে উদ্দাম ভাবপ্রেরণা হইতে, আবার ছন্দঝংকার ভাবানুভূতিকে করিয়াছে সাবলীল সঙ্গীতময় ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত। ভাবের একটানা একঘেয়েমীর মন্থরতা যদি কোথাও আসিয়া থাকে, ছন্দ ঝংকার অবাধ কলোচ্ছ্বাসে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহী কবিতার ছন্দ সঙ্গীতের একটি স্বকীয় সত্বা যেন ভাব ও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সুরচেতনায় হিন্দোলিত হইয়া উঠে। পাঠকের মন কবিতার ভাব ও ভাষাকেই শুধু উপলব্ধি ও উপভোগ করে না, করে ইহার সঙ্গীত প্রবাহকেও। শব্দধ্বনির উদাত্তরোল আমাদের সকল অনুভূতিতে বাজিতে থাকে। সমগ্র কবিতায় যে দুর্বার প্রচণ্ডতা অনুভব করা যায় তাহা আসিয়াছে বৈপ্লবিক ভাবোচ্ছ্বাস হইতেই শুধু নয়, তাহা প্রসারিত হইয়াছে ধ্বনি ও ছন্দের উদ্বেল কলকল্লোল হইতেও।

কবি নজরুলের ব্যাপক ও ভাস্বর জাতীয়তা বোধ সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও ভেদবুদ্ধিকে তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছে : সাম্প্রদায়িকতা যে স্বাধীনতা জাতীয়তা ও সর্বাঙ্গীন সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কবি তাহা উপলব্ধি করেন।

যখনই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে তখনই নজরুল প্রবল ও প্রচণ্ড ভাবে তাহা আক্রমণ করিয়াছেন। বলিষ্ঠ বাকভঙ্গিতে 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ম আঘাতে সে ঘৃণা ফাটিয়া পড়িতেছে।

এই ভাবতের মহামানবের সাগর তীবে হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চবিতেছে দিবানিশি।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য বাড়িছে ভারত সাগর বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙ্গে যায় একটারে ধবি আসি.
আরটা তখন দিবিব মোটায়ে হতেছে খোদাব খাসি।
শুনে হাসি পায় ইহাদের নাকি আছে গোধর্ম জাতি,
রাম ছাগল আর ব্রহ্ম ছাগল আবেক ছাগল পাতি।

—চিরঞ্জীব জগল্লুল

বদনাগাড়ুতে গলাগলি কবে নব প্যাক্টের আশনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই,
আঁটসাঁট করে গাঁটছড়া বাঁধা হলো টিকি আর দাড়িতে ;
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো ? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফসকা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষনে॥

—প্যাক্ট

ভারতের মুক্তি আন্দোলন যখনই তীব্র ও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে তখনই শাসকদের রাজনৈতিক চক্রান্ত সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। নজরুলের বৈপ্লবিক জাতীয় চেতনা এই আত্ম-কলহের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করিয়াছে। তিনি জানিতেন সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাতীয় জীবনকেই শুধু পঙ্গু করে না, ইহা মনুষ্যত্বকে ও খর্ব করে।

নজরুলের উদার জাতীয়তা বোধের আর একটা বিশেষত্ব কবির সমাজতান্ত্রিক মনোভঙ্গি। আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন চলিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিপুল সাফল্য আধুনিক ইতিহাসের এক নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি করে। দেশে দেশে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান দেখা দিল। সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় চেতনায় সমাজতন্ত্রের ভাবধারা জাগাইয়া দিল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্বুদ্ধ করিল নূতন সংগঠন শক্তি। বিশেষ করিয়া এশিয়ার পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবযুগের এই নূতন আদর্শে প্রেরণা ও আশ্বাস লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন এক বিপুল বিরাট গণ-অভ্যুত্থানে উদগ্র হইয়া উঠিল।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে সাম্য ও স্বাধীনতার যে বিপুল কামনা ভারতবর্ষে দেখা দিল তার ঝংকার ধ্বনিত

হইয়াছে নজরুলের অগ্নিবীণায়। সে যুগের গণচেতনাকে তিনি অভিনন্দনই জানান নাই, তিনি ইহাকে উদ্বুদ্ধও করিলেন। এসময়ে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রচণ্ডতা ও একাগ্রতাই নয়, ইহার দুর্জয় গণজাগরণ। মুক্তি-সংগ্রামে ধনী মধ্যবিত্ত কেরাণীর সহিত যোগ দিল শিক্ষক ছাত্র কৃষক মজুর। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতে সাম্যেব বাণী সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবন যেমন একদিকে এক বিরাট গণ-সংগ্রামের আকার ধারণ করিল, তেমনি অন্যদিকে ইহা সকল প্রকার সামাজিক বিভেদ বিরোধ ব্যবধানের পরিসমাপ্তির স্বপ্ন দেখিতেছিল। এই বিশাল বিপ্লবী চেতনা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পাইয়াছে কবি নজরুলের বলিষ্ঠ ভাষায় ও সাবলীল ছন্দে। বাংলা সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগে বঙ্কিমের প্রবন্ধে ও বিবেকানন্দের রচনায় সমাজের অনাদৃত উপেক্ষিত জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু নজরুলের পূর্বে বাংলার আর কোনো কবি মাটি ও মানুষেব এতো কাছে আসেন নাই : সমগ্র দেশে প্রসারিত ব্যাপক গণচেতনার বিচিত্র প্রকাশ আর কোনো আধুনিক বাঙালী কবির কাব্যে এমন গভীর সহানুভূতি ও জাতীয় আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এমন সংগ্রামী রূপ লাভ করে নাই। বাংলা সাহিত্যে বাস্তব পরিবেশের সান্নিধ্য এতোখানি আগে আসে নাই। সাহিত্য ক্রমশ রাজনীতির জাতীয় জীবনের

প্রভাবে আসিয়া পড়িতেছে ঃ জাতীয় সাহিত্যেব উদ্ভব হইতেছে। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের সাধারণ মর্মবাণী ব্যক্ত হইল নজরুলের কাব্যে। কবি সমগ্র দেশের সকল জনগণের পক্ষে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, তার কণ্ঠে ছিল সাম্যের চারণগীতি। আব্দুল কাদির লিখিয়াছেন ঃ দেশেব মাটি ও মানুষের দিকে তিনিই প্রথম চাহিয়াছেন সচেতন প্রেমের দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক মানুষের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খা তাহার বাণীতে করিয়াছে রসমূর্ত্তি লাভ।...নজরুল বিপ্লবী কবি।...মানুষের আত্মবোধ জাগ্রত হোক, পরমসত্ত্বা সম্বন্ধে সে সতর্ক হোক, সর্ব প্রকার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ সাম্যের প্রতিষ্ঠা করুক ইহাই কবির কাম্য।—**কাব্য মালঞ্চ**। এইভাবে বিচার কবিলে নজরুলকে বিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রথম জাতীয় কবি বলা যায়।

ঐ দিকে দিকে ডঙ্কা বাজিছে শংকা নাহিক আর,
মরিয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার,
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ,
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড় সেই হাড়ে উঠে গান,
জয় নিপীড়িত জণগণ জয়, জয় নব উত্থান।—**ফরিয়াদ**

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুশলিম ক্রীশ্চান।

*　　*

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

*　　*

গাহি সাম্যের গান
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
তাজমহলের পাথর দেখেছো, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে সাজাহান।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।

*　　*　　*

আজ নিখিলের বেদনা আর্ত পীড়িতেব মাখি খুন
লালে লাল হযে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।

—সাম্যবাদী

গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান্।

*　　*　　*　　*

আমি নর-কবি গাহি যেই বেদে বেদূইনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান।

—জীবন বন্দনা

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্তদম্ভে যে যৌবন আজ ধরি অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে।

*   *   *   *

গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

*   *   *   *

গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে,
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে,
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে।

—আমি গাই তারি গান

বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে না মাথায় বন্ধু বড়ো দুখে,
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছো গো সুখে।

*   *   *

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

—আমার কৈফিয়ৎ

সে যুগের জাতীয় সংগ্রামের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি মিলন ও সংহতির বাণী কবির দেশপ্রেমের কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের মহামন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। কিন্তু কবি

অহিংস জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনের শান্তি ও প্রেমের নীতি তার ব্যক্তি মানস ও অভিজ্ঞতার সহিত খাপ খায় নাই। একটি বৈপ্লবিক দুর্দম অভিলাষ তার জীবন সত্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য : প্রথম মহাসমরের সৈনিক নজরুলের সামরিক অভিজ্ঞতাও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অহিংসার নীতি মানিয়া লইতে পারে নাই। ত্বরিত মুক্তিলাভের উদ্দাম কামনা জীবনের সর্বাঙ্গীন বিপ্লব সাধনের উদগ্র আকুতি নজরুলের কাব্যের সর্বত্র একটি আপোশহীন উদ্ধত অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাব জাগ্রত করিয়া রাখে। শোষিত জনগণের কবি হিংস্র নির্মম দুশমনের প্রতি কঠোর ক্ষমাহীন ছিলেন।

আনকোরা হতে ননভায়লেণ্ট নন্-কোর দলও ননখুশী।
ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী মন তুষি।

* * * *

মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস।
হেরিনু জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।

* * * *

দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে না মাথায় বন্ধু বড়ো দুখে,
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ গো সুখে।

—আমার কৈফিয়ৎ

ইজিপ্ট তুরস্ক ইরান প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নবজাগৃতিকে অভিনন্দিত করিয়া নজরুল কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন। মুশলিম সংস্কৃতি ও সংহতি সম্বন্ধে কবির মনোভাব এই সব কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র এশিয়ায় স্বাধীনতালাভের যে গণ-সংগ্রাম ও চেতনা যুদ্ধোত্তর যুগে দেখা গিয়াছিল, মধ্যপ্রাচ্যের নব-জাগরণ এই বিরাট বিপুল রাজনৈতিক চেতনা ও মুক্তি কামনার অঙ্গীভূত। বিপ্লবী কবি নজরুল বাইরণের মতো পৃথিবীর সকল দেশের মুক্তি সাধনা ও সংগ্রামের জয় কামনা করিতেন। মুক্তিকামী বিদ্রোহী কবির কাছে স্বাধীনতার লড়াই দেশ জাতি নিরপেক্ষ একটি আদর্শের লড়াই। সুতরাং তার উদার উৎসাহ ও প্রেরণা সহজে বিদেশের নব-জাগৃতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে, ইহার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে। তাহা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে সফর করিয়া কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে কৌতূহল ও শুভেচ্ছা তাহার রহিয়াছে। সেই জন্য কবিকল্পনা মধ্যপ্রাচ্যে প্যান-ইস্‌লাম আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তুরস্কে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কামালপাশার প্রশস্তি পাই 'কামাল পাশা' কবিতায় :—

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে শামাল শামাল তাই,
কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।

প্যান-ইসলাম আন্দোলনের নেতা আনোয়ার পাশার প্রশস্তি আছে **'আনোয়ার'** কবিতায় :--

আনোয়ার, আনোয়ার,
দিলওয়ার তুমি, জোর তলোয়ার হানো, আর
নেস্ত ও নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার।

আরব দেশের নদী **'শাতইল আরব'** নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

শাতিল আরব, শাতিল আরব, পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।

প্রেমের কাব্যে বিপ্লবী নজরুল দেখা দিলেন এক সম্পূর্ণ বিপরীতরূপে : বিদ্রোহী হইয়াছে বাউল, বিশ্বজয়ী হইয়াছে ভিখারী। প্রেমের রসলোকে জাতীয় সঙ্গীতের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রবল প্রচণ্ড উল্লাস আকুতি সংঘাত সংঘর্ষ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বিরহ-বিধুর প্রেমের ব্যাকুলতা ও বেদনা দুর্দান্ত বিপ্লবীর দুর্জয় কামনাকে একেবারে করুণ কোমল মৌন মন্থর ভাবাবেশে উদাস করিয়া তুলিয়াছে : বেহাগ রাগের মূর্চ্ছনায় দীপকের বহ্নিবিভাস নীরব হইয়া গেল। পথ ছাড়িয়া কবি আশ্রয় নিলেন নীড়ে; অগ্নিবীণা খসিয়া গেল, বাজিয়া উঠিল একতারা। প্রেমের ভাব আরতি ও বিরহ বিলাসে কবির মন রসাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে। অন্তর্মুখী ভাবানুভূতির কল্পনা-সমারোহে প্রেমের কবিতা ও গান বিচিত্রিত; মধুর আশা আনন্দ

ও বিরহ বেদনার অভিব্যক্তির ভাষা ছন্দও কোমল মধুর গীতিধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কবিতার ভাবের সঙ্গেই প্রেমের কাব্য ও গানের ভাবের পার্থক্য নয়; ইহাদের কল্পনা সুর ও বাক্‌ভঙ্গিতেও ব্যবধান সুস্পষ্ট। জাতীয় কবিতা ও গানে ভাব ও ভাষার যে বলিষ্ঠ সাবলীল গতি অনুভব করা যায়, যে প্রবল প্রচণ্ড বৈপ্লবিক অভিলাষে জাতীয় কবিতাগুলি স্পন্দমান, প্রেমের কবিতায় তাহা নাই। প্রেমের কাব্যের ভাব ও ভাষা মধুর স্বপ্নাবেশেব গোধূলি দীপ্তিতে সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত বাংলা প্রেমের কবিতার সহিত নজরুলের প্রেমের কবিতার পার্থক্য বিশেষ নাই। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে যে বেদনা ও বিরহ, অসীমের আকুতি ও মিষ্টিসিজম্ দেখি, আধুনিক বাংলা গীতি কবিতায় প্রেমের সেই কল্পনা ভঙ্গিই দেখিতে পাই। ব্যর্থ প্রেমের যে বিরহ-বেদনা ও সকরুণ আশ্বাস নবীন সেন তাহার গীতিকাব্যে প্রবর্তন করিলেন, বিংশ শতাব্দীর কবির প্রেম গাথায় সেই চিরন্তন বিরহ-অশ্রুই ঝরিতেছে। বিহারিলাল প্রেমে যে অতীন্দ্রিয়তাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিলেন, অগ্নিযুগের কবির প্রেমের কাব্যে তার দীপ্তি ম্লান হয় নাই। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যে প্রেমের যে রূপটি দেখিতে পাই, নজরুলের প্রেম গীতিতে তার ব্যতিক্রম হয় নাই। রচনায় অবশ্য নজরুলী বাক্‌ভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়াছে, কিন্তু কবি কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রেমের প্রচলিত রোমান্টিক রীতি অনুসরণ করিয়াছে। তবে

নজরুলের প্রেমের কাব্যে মিষ্টিসিজম্ অপেক্ষা ব্যক্তিগত আবেগ আশা আনন্দ বেদনাবোধ তীব্রতরো হইয়া উঠিয়াছে ; কবির প্রেম ব্যক্তিগত জীবনের ভাবানুভূতিতে উষ্ণ ও উজ্জ্বল ; ইহাতে ইন্দ্রিয়ভোগের উল্লাসের সহিত আছে ভাবারতির একাগ্র ব্যাকুলতা ও বেদনা। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা নাই, আছে রূপ রস শব্দ গন্ধের ইন্দ্রিয়লোকের সীমান্তের মৃদু হাতছানি। কবিব মিষ্টিসিজম একটা দার্শনিক তত্ত্ব নয়, ইহা তাহাব বিরহ বিধুর প্রেমেব এক নূতন আস্বাদন। বিহারিলাল ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় মিষ্টিসিজমের যে নৈর্ব্যক্তিক ভাস্বর দীপ্তি আছে, নজরুলের কবিতায় তাহা নাই। কবির প্রেম মাটি ও মানুষেব কাছে থাকিয়া দিগন্তেব সুদূর উদাস ইঙ্গিতে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল ব্যথাতুর হইয়া উঠে। এই দুনিয়াব রংমহলেব বিচিত্র রঙ ও রূপের মিছিল দেখিয়া কবি মুগ্ধ ; গন্ধস্পর্শেব ঐশ্বর্যে উষ্ণ ও সুরভিত হইলেও তার প্রেমে ভাবানুভূতির এমন একটি আবেশ আছে যাহাতে পবিচিত হইলেও তার প্রিয়াকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে গন্ধ-বিভোর জ্যোৎস্নাব স্বচ্ছ আবরণ। তাহা ছাড়া বিবহের বেদনা প্রেমকে প্রাত্যহিক পরিবেশ হইতে দূরে লইয়া গিয়া চিরকামনালুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কবি কল্পনা চায় সুন্দর ও প্রেমেব নিবিড় সঙ্গ, ইহা নৈর্ব্যক্তিক কামনা নয় ; মনোময় হইয়া সে কামনা রঙে রেখায় রসে গন্ধে যৌবনারতি একাগ্র করিয়া রাখে।

তুমি ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এরূপ সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত আলো,
বিদায় বেলার সন্ধ্যা তারা
পূবের অরুণ রবি,
তুমি ভালোবাসো বলে ভালবাসে সবি।

—**কবিরাণী**

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটীরে,
খুশীর রঙে করবে সোনা ধূলি মুঠিরে।

* * *

তুমি আমার বকুল যূঁথি মাটির তাবা ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমাব কানেব পার্শি দুল।
কুসমী রাঙা শাড়িখানি
চৈতী সাঝেঁ পরবে রাণী,
আকাশগাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মূলতান।

—**এ মোর অহংকার**

তরুলতা পশুপাখী সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে আমি বসি বিশ্বকামনাতে।

  

আজ মনে হয়
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে,
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ,
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা।

  

তোমারে করিব পান, অনামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।

—অনামিকা

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর
আজকে আমার তোমার মাঝে সপ্তপারাবার।
আজকে তোমার জন্মদিন
স্মরণ বেলায় নিদ্রাহীন,
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকূল অন্ধকার,
এই সে হেথায় হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার।

—চৈত্রী-হাওয়া

আজ লাল পানি পিয়ে দেখি সব কিছু চুর,
সবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবী লেবুর।
হল মাদার অশোক ঘাল,
রঙণ তো নাজেহাল,
লালে লাল ডালে ডাল পলাশ শিমুল।
সখা তাহাদের মধু ক্ষবে মোরে বেঁধে হুল। —ফাল্গুনী

নাম হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে,
বেতস বেনুর বন—কে ঐ বাজায় বীণারে। —গান

কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা,
তোর পড়ল মনে কোন হারাঘর স্বপনপারের কোন অলকা।
—পলাতকা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ ছাওয়া চোখের-চাওয়া, উতল হাওয়া কেশের বাসে।
—গান

ব্যথার সাঁতার পানি ঘেরা চোরা বালিব চর,
ওরে পাগল কে বেঁধেছিস্ সেই চরে তোর ঘব!
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা
হাট তুলেছে সর্বহারা
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা ঝরছে মাথার পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি দুলিয়ে তরুকর। —সর্বহারা

নজরুলের প্রেমের কাব্যে নূতন সরসতা দেখা দিয়াছে হাফিজের ফার্শীগজলের অনুবাদে ও অনুসরণে রচিত গানে ও গজলে। জীবন-শাকী প্রাণ-পিয়ালায় লাল রঙীণ শরাব ঢালিয়া দিতেছে; ঠোঁটের কিনারায় তুলিয়া দেয় খুন-রাঙা পানি। কালের জোয়ারের ক্ষিপ্র স্রোতে বিশ্ব ভাসিয়া যায়; ফুলবাগিচায় ফুলের মরশুমে বুলবুলিরা যখন গান গাহিয়া উঠে তখন বিলোল আঁখি শাকীর রূপরৌশন আর লাল শরাবে ভরগেলাসের আহ্বান প্রেমে দীওয়ানা কবি উপেক্ষা করিতে পাবে না। পানশালাতে নেশায় মশ্‌ত মশগুল পানবেহুঁশ হাফিজ দেখা পায় তাব জীবনপ্রিয়ার, চটুল-আঁখি শাকীর মৌ-মিঠা চুনীর ঠোঁটের চুমায় খোশনসীব কবি পায় বেহেস্তের আস্বাদ; কবির কণ্ঠে জাগে গান; গুঞ্জরিত হয় গজল। নজরুল প্রেমের কাব্যে হাফিজী ঢঙ-এব প্রবর্তন করিয়া গীতি কাব্যে এক নূতন শক্তি ও সবসতা আনিয়া দিয়াছেন : কামনা ও উপভোগের সঙ্গে ইহাতে একটি অবাধ উদাব নির্লিপ্তি রহিয়াছে; নিবিড় ইন্দ্রিয়-আসক্তি ও ভোগেব সাথে দেখা দিয়াছে বন্ধনহীন একাগ্র একটি তীব্র ভাবরস। ইন্দ্রিয়ারতিতে তপ্ত ও দেদীপ্যমান হইলেও কবিতা ও গানগুলি বেদনার রসাবেশে সুকুমার মাধুর্যে শুদ্ধ সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা প্রাণের নেশার পাগল; লাল শরাবে ভরগেলাস,
পানবেহুঁশে আয় রেখে ঐ শাকীর বিলোল আঁখির পাশ॥

চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ ঢালার মতো শরাব ঢাল,
ছায়না যেন দিনের আনন কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁশ ॥
শরাবখানার সদর ঘরে বসো খানিক ধর্মাধিপ,
এই আনন্দধারায় নেয়ে নাও ধুয়ে সব পাপের বাশ ॥
মোমের বাতির মতো, সুফী, কেঁদে গলাও আপনাকে,
এই বিষাদ এই ব্যথার পাবে দাও আনন্দ, ভব আকাশ ॥
নূতন দিনের বঁধূ যদি আসে তোমার খোশনসীব
যৌতুক তায় দিয়ো লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস ॥

—দীওয়ান-ই হাফিজ গীতি

আসল যখন ফুলের ফাগুন গুলবাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায় ॥
মালঞ্চে আর ভোর না হতে বিরহী বুলবুল কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝরল গোলাব হিম হাওয়ায় ॥
পুরানো গুলবাগ এ ধরা, মানুষ তাতে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালী আয়ুর শাখা হতে তায় ॥
এই ধূলিতে হল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নতুন বঁধূ ঝরল জীবন ভোর বেলায়।
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁজ না হতেই যায় ঝরে,
হাজার আপশোষ নতুন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায়।

—দীওয়ান-ই হাফিজ গীতি

ভেঙেছি দ্বার, ফিরব না আর পুণ্যশালার জেলখানায়,
আদিম পিতা আদম ও তো স্বর্গ পেয়ে ছাড়ল তায়।
পুণ্য ফলের ভরসা করে কাটিয়োনা কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট লেখার বন্ধু তুমিই নও ওয়াকিফ-হাল।
বেহেশতের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর তব হুঁশিয়ার।
ঝাউ এর ছায়া, তরীব কিনার তাই নিয়ে থাক সুখবিভোর॥
মরণক্ষণে যদি হাফিজ রয় হাতে তোর শরাব-জাম,
মলিন ধরা হতে তোরে তুবস্থ নেবে বেহেশত দোর॥

—দীওয়ান-ই হাফিজ গীতি

ভাবস্থ, যখন করছ মানা বন্ধুরা সব আগলে ভাঁটি
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলেব মবশুমে ভাই শরাব খাঁটি,
ফুলবাগিচায় বুলবুলিরা উঠল গেয়ে হায়রে বেকুব,
এমন ফাগুন ফুলের ফসল, নাই কো শরাব?—সকল মাটি!

—গান

নজরুলের কবিকল্পনা ব্যাপক না হইলেও বৈচিত্র্যহীন নয়। প্রকৃতি ও শিশুজীবন অবলম্বনে রচিত তার কবিতাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নজরুলের কাব্যে প্রকৃতি রূপবিলাস ও চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ। কবি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়াছেন, কল্পনা দিয়া আমাদের ভাবজীবনকে প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত করিয়া তুলেন নাই, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীন ভাবে বিশ্ব-প্রকৃতির জীবনের সহিত একাত্ম ও ভাব-সঙ্গত

করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃতির স্বকীয় মর্যাদা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন বিশ্বের রূপ-সম্ভার ও সমারোহের আলেখ্য রচনা করিয়া। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথ মানুষের সহিত প্রকৃতির, জীবনের সহিত বিশ্বের যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কল্পনা করিয়াছেন তাহা সঙ্গতি সামঞ্জস্যের প্রেম ও মিলনের : জীবন ও প্রকৃতি রুদ্র-ভৈরব শান্ত-মধুর যে রূপেই অভিব্যক্ত হোক, তাহাদের অন্তরের অদৃশ্য মিলন ও সঙ্গতি অক্ষুন্ন অব্যাহত শাশ্বত হইয়াই আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতো বহির্বিশ্বের রূপবিলাসী চিত্রকর নজরুল প্রকৃতির রঙ ও রূপের শব্দ ও গন্ধের খবর বহিয়া আনিয়াছেন, বিশ্বজীবনের কোনো দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করেন নাই। চোখের সামনে কবি যাহা দেখিতেছেন তাহার ছবি একটু কল্পনার রসে রাঙাইয়া আঁকিতেছেন ; প্রকৃতির বিচিত্র মোহন প্রতিমা দেখিয়া মুগ্ধ কবি গানে কবিতায় প্রাণের আনন্দটুকু প্রকাশ করে।

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত ?
নবীন ধানের আঘ্রানে আজি অঘ্রাণ হল মাৎ !

* * *

মাঠের সাগর জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটার টান,
রাখাল ছেলের বিদায় বাঁশীতে ঝুরিছে আমন-ধান।

—**অঘ্রাণের সওগাত**

ঐ ঘাসের ফুল মটর শুঁটীর ক্ষেতে
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে।
এই রোদ-সোহাগী পউষ প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল মৌ-ক্ষেতে।
আমি আমন ধানের বিদায় কাঁদন শুনি মাঠে রেতে।

—অকেজোর গান

ডাকত ডাহুক জলপায়রা নাচত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আশমানে গাঙচিল।
হঠাৎ জলে রাখতে পা
কাজলা দীঘির শিউরে গা
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল ঝিল।
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর দীঘির নীল।

—চৈতী হাওয়া

সই পাতালো কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ ধরণী ?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী।
অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘদূত মন মোহিয়া।
চঞ্চুতে রাঙা কলমীর কুঁড়ি, মরতের ভেট বহিয়া
সখীর গাঁয়ের সেঁউতি বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ,
আশমানী তার মৃন্ময়ী সখী মিশিয়াছে মেঠো পথমাঝ।

আকাশ এনেছে কুয়াশা উড়ুণী, আশমানী-নীল কাঁচুলি।
তারকার টীপ, বিজুলীর হার, দ্বিতীয়া চাঁদের হাঁসুলি।
ঝরা বৃষ্টির ঝরঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত আকাশ ভুবনে, সই পাতিয়েছে দুজনে।—**রাখী বন্ধন**

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে শিশুদের জন্য যে সঞ্চয় রহিয়াছে তাহাতে কবি নজরুলের ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান অবদান আছে। শিশুমনের দাবী দাওয়ার বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলা শিশু সাহিত্যের অনেক রচনা ব্যর্থ উপেক্ষিত হইলেও সমগ্র ভাবে ইহার সার্থকতা অবহেলা করিবার নয়ঃ বাংলার শিশুসাহিত্য সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া যে স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ইহা শিশুসাহিত্যিকদের দক্ষতার পরিচয়। ইহার ব্যাপকতা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য কম; ইহার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু ইহার অস্বাভাবিকতা ও কম নয়; শক্তি ইহার আছে, আবার শিশুসাহিত্যের দুর্বলতাও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তবু বাংলার শিশুসাহিত্য একটি নিজস্ব ধারা ও ভঙ্গির প্রবর্তন করিয়াছে। নজরুল মুষ্টিমেয় কবিতা লিখিয়াছেন; এই কবিতাগুলি শিশুমনের চিরন্তন কৌতুক ও কৌতূহল জাগাইয়া দেয়, শিশুদের বাস্তব জীবন কল্পনা, ক্রীড়া ও কর্মকে কেন্দ্র করিয়া এই শিশুকবিতাগুলি লিখিত। সেইজন্য শুধু শিশুরা নয়, শিশুদের পিতা-মাতা দাদা-দিদিরাও এইগুলি পড়িয়া আনন্দ পায়, কৌতুক বোধ করে।

ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠরে ;
ঐ ডাকে যুঁই শাখে
ফুল খুকী ছুটবে।
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ওই,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ওই রামা হৈ।

—প্রভাতী

বাবুদের তালপুকুরে
বাবুদের ডালকুকুরে
সে কি বাস্ করলো তাড়া
বলি থাম একটু দাঁড়া।

—লিচুচোর

ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক !
বাতাবীলেবু সকলগুলো,
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো।

—খুকী ও কাঠবেড়ালী

আধুনিক বাংলা কাব্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার যে ধারা কবি ঈশ্বর গুপ্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা প্রবর্তন করেন আজো তাহা অব্যাহত আছে। আধুনিক বাংলার সকল শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত কবি কিছু না কিছু বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন। ব্যঙ্গের লক্ষ্য সামাজিক দুর্নীতি ব্যভিচার নৈতিক স্খলন আতিশয্য ধর্মের ভণ্ডামি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও স্বার্থ। আমাদের বিদ্রূপাত্মক কাব্য ধারা খুব ব্যাপক নয়, ক্ষীণ হইলেও ইহার তীব্রতা কম নয়। অতীত-আঁকড়ানো প্রাচীন অন্ধ সংস্কারপ্রিয় বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নিষ্পিষ্ট আমাদের জীবনে হাস্যোদ্দীপক অনেক বিষয় পাওয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জীবন ধারা ও সভ্যতা যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে আমাদের স্থবির ও প্রাচীন সমাজের খাপছাড়া অসঙ্গতি ও বিকৃতি সুস্পষ্ট হওয়া জীবনে উপহাসের পরিধি ও পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। কৌতুকপ্রিয় বাঙালী কবিরা আমাদের জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক ও ব্যঙ্গাত্মক ঘটনা ও পরিস্থিতি লইয়া গান বাঁধিয়া বাংলা কাব্যের একটি প্রান্তভাগ হাস্য-কলরবে ঠাট্টা-বিদ্রূপে মুখর ও মশগুল করিয়া তুলিয়াছে। নজরুলের যে কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে, বিদ্রূপের তীব্রতায় স্ববিরোধী অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি প্রকাশে, গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির অবারিত উদ্ঘাটনে সেই কবিতাগুলি বলিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। দেশপ্রেমের গানে ও কবিতায় কবিমানসের যে

বিপুল প্রচণ্ডতা বলিষ্ঠ কল্পনা ও দুর্নিবার আঘাত হানার অভিলাষ দেখা যায়, বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিতেও তার আভাস সুদূর প্রতিধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠে। কবির বৈপ্লবিক মনোভঙ্গিরই লঘু তরল অভিব্যক্তি এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা ঃ এইগুলিতেও একটি উজ্জ্বল আবেশ ও উদ্বেল গতি আছে ঃ অবারিত একটি অবরোধমুক্ত প্রাণ-নির্ঝর হাস্যমুখর ছন্দে বহিয়া চলিয়াছে।

উল্টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করেন, সাদ করেন চড়ুইভাতি।

* * * *

সস্তাদরে দস্তা মোড়া আসছে স্ববাজ বস্তাপচা,
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আসলে যুঝি দেহির খোঁচা।
গুণীরা খায় বেগুনপোড়া
বেগুন চড়ে গাড়ী-ঘোড়া,
ল্যাংড়া বসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে।

—দেগচুর গা-ধুইয়ে

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফর্‌সা।
মরন হরণ লিখিল শরণ ভয়ে শ্রীচরণ ভরসা॥

* * * *

সার্জেণ্ট যবে আর্জেণ্ট মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদপ্রবৃদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে।

—শ্রীচরণ ভরসা

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু সে গেল মিঞার ঘরে,
আমার কালীমা ছড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে বুঝি মুস্লেম করে।

—**কীর্ত্তন**

এ কোন্ এল বালাই এ যে পালাই বলো কোন দেশ,
গাছের নীচে ঘড়েল শিয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ।
কন্যা ডোবা বন্যা এলো ভাসল বুঝি ঘর দ্বার॥
আয়েস করে ধুম্ড়ো মেয়ের বাড়বে বয়েস চৌদ্দ
বাপের বুকের তপ্ত খোলায়? দিব্বি গেয়ান বোধত।
হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে ছাড়ল নাড়ী বড়দার।

—**সরদা আইন**

কবি নজরুলের কল্পনাউজ্জ্বল রোমান্টিক আর্ট প্রাত্যহিক জীবনের চঞ্চল পরিবেশ ও রাজনীতির আলোক ও উত্তাপ সমৃদ্ধ বাস্তবতার সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। রোমান্টিক হইলেও নজরুলেব কাব্য—শিল্প প্রচলিত বাংলা কাব্যের রোমান্টিক আর্ট হইতে স্বতন্ত্র। বিহারিলাল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির রচনায় যে কল্পনা—সমারোহ, মিষ্টিসিজ্ম ও দার্শনিকতা রহিয়াছে, নজরুলের স্বদেশী গানে জাতীয় কবিতায় প্রেমের কাব্যে তাহা নাই। তাহার দেশপ্রেমের কবিতায় বে বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাস প্রবল প্রচণ্ডতা ও পল্টনী ঢঙ্ দেখা যায়, সমসাময়িক ইতিহাস ও রাজনীতির বাস্তব পরিবেশের যে গভীর প্রভাব তাহার কাব্যে পড়িয়াছে, তাহাই নজরুলের রোমান্টিক আর্টে

আনিয়া দিয়াছে এক নূতন শক্তি নূতন সম্পদ। বাংলা কাব্যে ও গানে রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের সমস্যার প্রভাব স্বদেশী যুগ হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্তী যুগে সাময়িক ইতিহাসের বাস্তব পরিবেশ এমন রুদ্র ভৈরব প্রচণ্ড প্রবল বৈপ্লবিক মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। কবি নজরুল প্রথম রুদ্র কঠোর কুৎসিত বাস্তবকে রোমান্টিক কল্পনায় রঙীন করিয়া বিদ্রোহের অগ্নি মন্ত্র বাংলা কাব্যে প্রচার করিলেন। সমসাময়িক ইতিহাস ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও সাক্ষাৎ সম্পর্ক তাহার রোমান্টিক কাব্যশিল্পকে প্রাণবান ভাস্বর গতিশীল করিয়া দিয়াছে। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত রোমান্টিক আর্টের হতাশা ও বেদনার সুর ব্যর্থতার আক্ষেপ নাই, না-পাওয়াকে পাইবার মর্মকাতরতা ও দুঃখবিলাস নাই, হারানো অতীতের জন্য ব্যর্থ ক্রন্দন নাই এবং অদৃশ্য অজানার সন্ধানে অশ্রুসজল নিশাভিসারও নাই। বাস্তবতার বিচিত্র প্রাণচঞ্চল স্পর্শে তাহার জাতীয় সঙ্গীত ও গানগুলি জোরালো ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় বাংলা গীতি কাব্যের রোমান্টিক আদর্শই স্বীকৃত হইয়াছে। ভাব কল্পনা ও রচনা ভঙ্গিতে এই প্রেম-সঙ্গীত বাংলা কাব্যের রোমান্টিক আর্টকেই অনুসরণ করিয়াছে। বিহারিলাল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির

প্রেমগীতির মিষ্টিসিজ্‌ম ইহাতে নাই; সুরেন্দ্রনাথ. দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির ইন্দ্রিয়ভোগের বর্ণসমারোহ নজরুলের প্রেমের কল্পনাকেও মধুরোজ্জ্বল করিয়া তুলিযাছে। বাস্তবতার প্রতি নজরুলের সহজ আকর্ষণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতি তাহার নাড়ীর টান এখানেও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। জীবনের বাস্তব পরিবেশের রূপরস কবিকল্পনাকে সহজেই উদ্‌বুদ্ধ করে। দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি কবির না থাকিলেও জগতের রূপ-বৈচিত্র্য তাহার রসলিপ্সু মনে গভীর রসসংবেদনা জাগাইয়া দিয়াছে। নজরুলের রোমান্টিক মন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ আশা নিরাশা মিলন বিরোধের ভিতরে আনন্দ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সন্ধান করিয়া ফিরে। জীবনকে সে ভোগ করিতে চায়, ইহার তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায় না।

নিজের রচনা সম্পর্কে নজরুল **'আমার কৈফিয়ৎ'** কবিতায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার কাব্যশিল্পের স্বরূপ বোঝা যায়। কবি বলিয়াছেন :—

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি',
কবিও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি,

*　　*　　*

যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই, কবি?
দুষিছে সবাই আমি শুধু গাই প্রভাতের ভৈরবী।

*　　　*　　　*

গুরু কন তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁছা।

*　　　*　　　*

ভক্তরা বলে নব যুগ রবি,
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটিতরে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কষে কষি হৃদপেশী।

বাঙালী সমালোচক 'হুজুগের কবি' নজরুলের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেও তাহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ মনে হয়, নজরুলের কাব্যে দার্শনিকতা নাই ; অতীন্দ্রিয় রসাবেশ নাই, তার রোমান্টিক কল্পনা গহন অতলস্পর্শ ভাবলোকের মণি সম্পদ কুড়াইয়া আনে নাই : তার রচনায় গীতি কবিতার কমনীয়তা ও সুষমা, সৌকুমার্য ও সৌষ্ঠব কম। কবির ভাবে ও ভাষায় বাস্তবতার রূঢ় রুক্ষতা গীতিকাব্যের ভদ্র ও শুদ্ধ মসৃণতা ও আভিজাত্যকে খর্ব ও ক্ষীণ করিয়াছে। রোমান্টিক কাব্যের শান্ত মধুর পরিবেশ পরিচিক্স ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অভিলাষের ধূলামাটির মলিন স্পর্শে চঞ্চল ও কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। জনস্রোতচঞ্চল কর্মকলরবমুখর রাজপথ হইতে দূরে লোকালয়ের বাহিরে বসিয়া রোমান্টিক কবি-কল্পনা ভাবের যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে নজরুলের কল্পনা সে ধরণের নয়, মানুষের মিছিলের সহিত পথে চলিতে চলিতে জনতার কবির কণ্ঠে সারিগানের জোয়ার

নামিয়াছে ; ইহাতে যে রোমান্টিকতা আছে তাহা সহজ জীবনবোধ, মনুষ্যত্ব ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতির। ইহাতে ভাববিলাস স্বপ্নাবেশ কম, ঘাত প্রতিঘাত ও জীবন সংগ্রামে রক্তাক্ত কবি মানসের অগ্নি-স্ফলিঙ্গে ইহা বহ্নিমান ও উদ্ভাসিত। ভাবের স্বপ্ন-বিধুরতা হইতে কর্মের প্রেরণা ইহাতে বেশী। সেইজন্য কাব্য-সমালোচনার যে মান বিহারীলাল অথবা রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিয়া লয় তাহা নজরুলকে শ্রেষ্ঠ একজন বাঙালী কবি হিসাবে অভিনন্দিত করিতে কুণ্ঠিত। কালের গতি ও যুগের রুচি দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে বাস্তব পরিবেশ ও রাজনীতির প্রভাব ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। বাংলা কাব্য বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের মাঝখানে নামিয়া আসিতেছে। সাহিত্যে রিয়ালিজম আমাদের ক্ষিপ্র পরিবর্তনশীল বিশ্ব-পরিবেশের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়াছে। আধুনিক আর্টে জীবনের প্রাত্যহিক রিয়ালিজম একটি মৌলিক ও অনিবার্য উপাদান। ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আর্ট ও সাহিত্য রাজনীতির ও বাস্তব জীবন সমস্যার আওতায় আসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাসমরের যুগ হইতে বিশ্বসাহিত্যের এই লক্ষণ অতি স্পষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মন দ্রুত সচেতন ও কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছে। তাই মনে হয় আগামী যুগের নূতন জীবন দর্শন নজরুলের কাব্য

ও আর্টের মর্যাদা অনুভব করিতে পারিবে যদিও আজ দেশে কবির খ্যাতি ম্লান হইয়া আছে। এ বিষয়ে কবি অবশ্য উদাসীন নির্লিপ্ত : 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তিনি বলেন : 'পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে···।' কবির আকাঙ্ক্ষা শুধু এই--

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লিখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।
—আমার কৈফিয়ৎ

কাব্যে অনুপ্রাস প্রীতি বাঙালী কবির একটি সাধারণ বিশেষত্ব : ঈশ্বর গুপ্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল আধুনিক বাঙালী কবি অপর্যাপ্ত অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস আতিশয্য যেমন তার কাব্যরচনার একটি প্রধান ত্রুটি তেমনি রবীন্দ্রনাথের সংযত প্রয়োগ কাব্যের সুষমা ও শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল অনুপ্রাসের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়া কাব্যের ভাব ও ছন্দের সুষমা ও সঙ্গীতমাধুর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দপ্রবাহে অনুপ্রাস নজরুলের কাব্যের সুরঝংকার আনিয়া দেয়।

চৈতীরাতির গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর।—**চৈতীহাওয়া**

আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুণমাখা তূণ,
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল,
ফাগ লাগে ঐ দিগবাসে,
দিগবালিকার পীতবাসে ;
আজ রঙন এল রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে।

—সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

মৌ লোভী যত মৌলভী আর মোল-লারা কন হাত নেড়ে ;
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজীটার জাত মেরে।

—ফরিয়াদ

আদর গর গর, বাদর দর দব
এ তনু ডর ডর কাঁপিছে থর থর···।

—গান

আশমানের ওই আঙ্ রাখা
খুন খারাবীর রঙ্ মাখা,
কি খুব সুরৎ বাঃরে বা
জোর বাজা ভাই কাহারবা।

—কামালপাশা

আমি চলচঞ্চল, ঠমকি ছমকি,
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল ;
আমি চপলা চপল হিন্দোল —বিদ্রোহী

প্রাচীন যুগে ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যের খ্যাতি ছিল। আধুনিক বাংলায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ সে খ্যাতির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু নজরুলের কাব্যেও ছন্দপ্রয়োগ কুশলতা ও বৈচিত্র্য কম নয়। বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্র ছন্দকৌশল নজরুল দেখাইয়াছেন, ভাষার প্রয়োগ ও ছন্দের ব্যবহারে নজরুলের অপূর্ব কারিগরি আছে। কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষাকে অনুসরণ করিয়া ছন্দের সুর ঝংকার কবি কল্পনাকে মধুর ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া দিয়াছে।

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু ;
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।

—গান

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে
তরঙ্গে দোলে আজি নাইয়া রণতরঙ্গ ছন্দে।

—গান

রেশমী চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরমকথা,
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ সরমলতা।

—গান

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে ;
আকাশ ছাওয়া চোখের চাওয়া
উতল হাওয়া কিসের বাসে।

—গান

ঝিঙে ফুল ঝিঙে ফুল,
সবুজ পাতার দেশে-কি রোজিয়া ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল, ঝিঙে ফুল।

—ঝিঙে ফুল

ডাইনী তুমি হোৎকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক।

—খুকী ও কাঠবেড়ালী

পকুরেব ঐ কাছে না
লিচুব এক গাছ আছে না।

—লিচু চোর

বলাকাব মুক্তকছন্দে নজরুল তাহাব অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা লিখিয়াছেন : "বিদ্রোহী" "রণভেরী" "আগমনী" "ধূমকেতু" "কামাল-পাশা" "কোরবানী" প্রভৃতি কবিতায় বিপ্লবী কামনা ছন্দের অবাধ স্বাধীনতায় আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

আসি যুগে যুগে : আমি আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু :
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

—ধূমকেতু

তবে বাজাও বিষাণ, উড়াও নিশান, বৃথা ভীরু সমঝায়,
রণত্বুর্মদ রণ চায়।

—রণ ভেরী

ঘরে ঘরে আজ দীপ জ্বলুক,
মার আবাহন গীত চলুক,
দীপ জ্বলুক,
গীত চলুক,
আজ কাঁপুক মানব কল কল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম।

--আগমনী

আমি মানি না কোনো আইন
আমি ভরা তরি করি ভরাডুবি. আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি এলোকেশে ঝড অকাল বৈশাখীর,
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহীসূত বিশ্ববিধাত্রীর।
বল বীর
চির উন্নত মম শিব।

—বিদ্রোহী

নজরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি বহু ফার্শী আরবী ও হিন্দী শব্দ তাহার কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কবিতা স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পাঠকেরা নালিশ করেন। এ কথা ঠিক নজরুল কোন কোন কবিতায়

ফার্শী আরবী ও হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এইগুলির প্রয়োগ বেশী মুশ্লিম উৎসবের ও মধ্যপ্রাচ্যের নবজাগৃতির কবিতায়, গজল ও পল্টনী গান ও কবিতায়। এরূপ কবিতার সংখ্যা বেশী নয়। নজরুলের বেশীর ভাগ কবিতার ভাব ও ভাষা বাংলা সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। যে সব কবিতায় ফার্শী ও হিন্দী শব্দ কবি ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির পটভূমিকা মনে রাখিলে এরূপ শব্দ ব্যবহারের সঙ্গতি ও প্রয়োজন বোঝা যায়। মুশ্লিম সমাজের আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতি শিষ্টাচার ফার্শী আরবী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত, মধ্যপ্রাচ্যের জীবন ও নব জাগরণের প্রকাশে আরবী ফার্শী শব্দের প্রয়োগ-সঙ্গতি রহিয়াছে। এ সকল শব্দ ব্যবহার করাতে কবিতাগুলির ভাব-পরিবেশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গুপ্ত কবি কবিতায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সাময়িক জীবন ও ঘটনা বর্ণনায় ও ব্যঙ্গচিত্রে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও কবিতায় ফার্শী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে। ভাবের উপযুক্ত পরিবেশ ও রসসৃষ্টির পটভূমিকা তৈরীর জন্য নজরুল ফার্সী ও আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অপ্রচলিত অথবা কম প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া বোধহয় ইহাদের প্রচলন বাড়াইবার চেষ্টা কবি করিয়াছেন।

নীল সিয়া আশমান, লালে লাল দুনিয়া ;
আম্মা, লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া। —**মোহররম্**

হেরেম বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল,
নওরোজের নও-ম' ফিল ;
সাহেব গোলাম খুনী আশেক
বিবি বাঁদী সব আজিকে এক,
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক,
দিলে দিলে মিল একশামিল।
বেপরোয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-ত'বিল।

—**নওরোজ**

আনোয়ার। জিঞ্জীর—
পরা মোরা খিঞ্জীর ;
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোনা রিণঝিন কির ;
নিবু নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিনকির গর্দানে জিঞ্জির।

—**আনোয়ার**

কামাল তুণে কামাল কিয়া ভাই ;

*   *   *

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া
বুজ দিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া।

*　　　　*　　　　*

মার দিয়া ভাই মার দিয়া ;
দুশমন সব হার গিয়া,
কিল্লা ফতে হো গিয়া,
পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই যো গিয়া,
কিল্লা ফতে হো গিয়া.
হুর রে হো,
হুর রে হো।

—কামালপাশা

সুকান্ত

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে রচিত ঐকতান নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নূতন যুগের কবির কাব্যে নতশির মৌনমুখ শুষ্ক অবজ্ঞাত মানুষের যে মর্মবাণী শুনিবার সকরুণ আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সেই গণবাণী কতকটা ব্যক্ত হইল সুকান্তের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ নূতন কবির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন ঃ

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার—
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্বারি।
সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূখ যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

—ঐকতান

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত বাংলা কাব্যধারার সহিত সুকান্তের কাব্যের পার্থক্য নিজেই সুকান্ত লিখিয়া গিয়াছেন :

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি—
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।

*　　*　　*

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

—**রবীন্দ্রনাথের প্রতি**

সুকান্তের কবিতায় একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে : বাস্তব জীবনের দৈনিক সমস্যায় বিব্রত মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার দুরন্ত কামনা, জীবনের দুশমনের সহিত লড়াই করিবার দুর্জয় সাহস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বপরিবেশে সুকান্তের কবিতাগুলি রচিত। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সম্মিলিত যে সংগ্রাম

ঘটিয়া গেল তাহাতে শোষিত উৎপীড়িত মানুষ জাগিয়া উঠিয়া অত্যাচার অন্যায় দারিদ্র্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল ঃ স্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণীবিরোধ তীব্র হইয়া দেখা দিল ; পরাধীন উপনিবেশগুলিতে মুক্তির আন্দোলন গণবিপ্লবে ফাটিয়া পড়িল। সাম্রাজ্যশাসনের নির্মম নিষ্পেষণ উপেক্ষা করিয়া সেইদিন ভারতের জনসাধারণও মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিবার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছিল। স্বদেশের পীড়িত মানুষের সর্বাত্মক সংগ্রামের সর্বাঙ্গীন সংকল্পের উদাত্ত আহ্বান শুনি সুকান্তের কাব্যে। একটি সার্বজনীন বিশ্বকামনা তার কবিতাগুলির ঐকতানে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিবাব স্বাধিকারচেতনায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষেব একাগ্র একান্ত সর্বগ্রাসী দুরন্ত কামনা। এই সংগ্রাম মনোলোকের নৈতিক যুদ্ধবিলাস নয়, ইহা মানুষের সহিত মানুষের প্রত্যক্ষ পরিস্ফুট শ্রেণীস্বার্থের দুর্জয় সংঘাত। ইহা বাস্তবজীবনের জাগ্রত সমস্যা সমাকীর্ণ পরিবেশের নূতন রূপ প্রতিষ্ঠার গণ-আয়োজন। সুকান্তের কবিতা পাঠকমনকে ঘুম পাড়াইয়া অভিভূত আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না। ইহা ঘুম ভাঙানী গান ঃ জাগরণের সঙ্গীত। প্রচলিত রোমান্টিক কাব্যের সহিত সুকান্তের কাব্যের মৌলিক পার্থক্য এইখানে। কবি শোষিত বুভুক্ষু নিপীড়িত মানুষের নিষ্পেষিত জীবনের প্রতিকূল জীর্ণ পরিবেশ ও ব্যবস্থা এবং ইহাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক

মানুষের বিরুদ্ধে একাগ্র তীব্র সংগ্রামের সুদৃঢ় সার্বজনীন সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বেদনার ভাববিলাস নাই : আছে সমাজের মানুষেরই গড়া দুঃখদুর্দশার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সমবেত অভিযান। ইহা শুধু ভাঙে না, গড়েও : প্রাচীন জীর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে উৎখাত করিয়া সভ্য সুস্থ মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশেব উপযোগী সমাজ গড়িয়া তুলিবাব প্রবল কামনা এই কাব্যে ব্যক্ত হইল। এখানে কাছে থাকিয়াও যাহারা দূরে বহিয়াছে তাহাদের বাণী অখ্যাতজনের কবি সুকান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। নির্যাতিত মানুষের চরম দুঃখ দুর্ভাগ্য শোষণ ও পীড়নের করুণ কাহিনী কবি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে দুঃখবিলাস নাই বেদনার অশ্রুসজল নৈরাশ্যেব হা-হুতাশ নাই : আছে দুঃখদুর্দশা অন্যায় অত্যাচার শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মানবতা ও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার ভৈরব আহ্বান। এখানেই প্রচলিত রোমান্টিক কাব্যের সহিত সুকান্তের কাব্যেব মৌলিক পার্থক্য। দুর্ভাগ্য দুর্দশা লইয়া ভাববিলাস সুকান্ত কবেন নাই : কল্পনা দিয়া বেদনা লাঞ্ছনায লজ্জিত বিষণ্ণ দিনগুলিকে মসৃণ মোলায়েম মধুর ও করুণ করিয়া তুলেন নাই। বুভুক্ষু অপমানিত জীবনের প্রত্যক্ষ দুঃখ ও ব্যথা লইয়া কবি ভাবালুতা ও আক্ষেপ করেন নাই ; নিস্ফল অসহায় ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে কবি বিক্ষুব্ধ ও কল্পনাবিলাসী হইয়া উঠেন নাই।

দুর্ভাগ্য ও দুঃখ জয়ের মিছিলে কবি সবাইকে আহ্বান করিয়াছেন, ডাকিয়াছেন শোষিত নির্যাতিত জনগণের দুর্দশা মোচনের দুর্জয় সমবেত অভিযানে। কবি দেখিয়াছেন চারিদিকে দেশে দেশান্তরে অভিযাত্রী মানুষ চলিয়াছে মুক্তির সন্ধানে: এই শোভাযাত্রাকে কবি অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং ইহার সামগ্রিক চরম সফলতায় কবি বিশ্বাসী। গণযুগের আসন্ন অভ্যুদয়ে কবির বিশ্বাস সুদৃঢ় ও সর্বাত্মক: এই নবযুগের যারা অগ্রদূত কবি তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছেন এই আশ্বাস ও বিশ্বাস লইয়া যে পৃথিবীর ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে তাহা শুধু আসন্ন নয় তাহা অব্যাহত অক্ষয় অনিবার্য।

ঘরে তোলো ধান বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারি গান হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ কর শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।

—পূর্বাভাস

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে ;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়াছবি ভাসছে ;
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।

আজকের দিন নয় কাব্যের,
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের ;
শরতের অবকাশে শোনা যায় আকাশের বাঁশরী,
কিন্তু বাঁশরী বৃথা—জমবে না আজ কোনো আসরই ।

*　　　*　　　*

তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি ।
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের মরণযজ্ঞ চলে নিত্য ;
পণ কর দৈত্যের অঙ্গে—
হানবো বজ্রাঘাত মিলবো সবাই এক সঙ্গে ;
সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ করো সকলে—
বাঁচাবো আমার দেশ যাবেনা সে শত্রুর দখলে ;
তাই আজ ফেলে দিয়ে শিল্পীর তুলি আর লেখনী,
একতাবদ্ধ হও এখনি ।

—পূর্বাভাস

একদা যুদ্ধ শুরু হলো সারা বিশ্ব জুড়ে,
জগতের যতো লুণ্ঠনকারী আর মজুরে,
চঞ্চল দিন ঘোড়ার খুরে ।

উঠি উদ্ধত প্রাণের শিখরে, চারিদিকে চাই,
এলো আহ্বান জনপুঞ্জের শুনি রোশনাই
দেখি ক্রমাগত কাছে উৎরাই ;
হাতছানি দিয়ে গেলো শস্যের উন্নত শীষ,
জনযাত্রায় নতুন হদীশ,
সহসা প্রাণের সবুজে সোনার দৃঢ় উষ্ণীষ।

—**পূর্বাভাস**

মানুষের সর্বাঙ্গীন সভ্যতা সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের ব্যাপক প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে কবি সামাজিক জীবনের শ্রেণী সংঘর্ষের ও জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও অগ্রগতির অভিযান বর্ণনা করিয়াছেন : জনজাগৃতির যুগে জনতাই আধুনিক জগতের মুক্তির মিছিলে নেতৃত্ব করে। যুগ যুগ ধরিয়া শোষিত ও নির্যাতিত যে মানুষ সভ্যতার ইমারৎ গড়িয়া তুলিয়াছে অথচ নিজের রক্ত দিয়া গড়া সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আস্বাদ হইতে বঞ্চিতই রহিয়া গেল, সেই উপেক্ষিত মানুষ আজ আত্মশক্তির সম্মিলিত উৎসের সন্ধান লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার সমবেত প্রয়াস শুরু করিয়াছে : এই মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত আপোশহীন, কিন্তু মানবতার গভীর অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল। ইহা মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবনবিকাশেরই চেষ্টা : কোনো একটি দেশে ইহা সীমাবদ্ধ নয়। কবির অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী : দেশ-বিদেশের কয়েকটি আধুনিক ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থানের কাহিনী ও মানবনেতার সম্পর্কে রচিত কবিতায়ই কবির প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় নয়; সে পরিচয় মিলে তার জীবন দর্শনে, লেখার ভঙ্গিতে, পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত গণচেতনার পরিস্ফুট উদ্ঘাটনে। ১লা মের বিশ্বব্যাপী উৎসবে, হাসানাবাদ, কলিকাতা, কাশ্মীর, বোম্বাই, রোম ও ইউরোপের অন্যান্য নগরের গণবিক্ষোভে কবি শোষিত নিষ্পেষিত মানব জীবনের মুক্তির একটি অভিন্ন অব্যাহত প্রকাশ লক্ষ্য করেন: ইহাদের মূল সংযোগ ও সাদৃশ্য কবি অনুভব করিতে পাবেন বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেশের জনগণের সহিত পরিচয় থাকিলেও তার দৃষ্টি প্রসারিত: সহানুভূতি বিশ্বব্যাপী।

দিক হতে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে— পূর্বকোন।

—**বিদ্রোহের গান**

বন্ধু আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী
আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি
তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন।

—**অভিবাদন**

পাখীদের মাতামাতি: বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠেনি সূর্য তবু আজ শুনি জনরব।—**জনরব**

আধুনিক বাঙালী কবিরা অনেক সময় সামাজিক জীবনের ত্রুটী বিচ্যুতি লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন : প্রচলিত কুসংস্কার অর্থহীন রীতিনীতি ভণ্ডামি ও ব্যভিচার তাহাদের বিদ্রূপাত্মক কবিতার প্রেরণা দিয়াছে। লঘু হালকা ব্যঙ্গকৌতুক সুকান্তের কাব্যে নাই : সমাজ পরিবেশে দুর্বলতার ত্রুটী লইয়া চপল হাস্য-কৌতুক করিবার নাস্য তাহার ছিল না। সমাজ ব্যবস্থার মূলে যেখানে সকল দুঃখ দুর্দশার পাতালপুরী গোপন রহিয়াছে তার উৎসুক দৃষ্টি সেখানে গিয়া আবিষ্কার করিয়াছে মানুষের ব্যর্থতার সামাজিক কারণ। হাস্য-কৌতুক দিয়া জীবনের ব্যর্থতা বিফলতাকে লঘু চপল করিবার অবকাশ নূতন জীবন গঠনে অভিযাত্রী কবির সংকল্প-সংবদ্ধ মনে নাই। জীবন যেখানে বিপ্লবী দৃঢ়তায় সমাজ গঠনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেখানে হালকা চপলতার ক্ষণিক দীপ্তির বিদ্যুৎরেখা ফুটিয়া উঠেনা। কবি কল্পনাবিলাসী নন : জনগণের মিছিলে তিনিও একজন সৈনিক কর্মী ; তার কবিতা অনুভূতিসমৃদ্ধ হইলেও ইহা নূতন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার কর্মোদ্যমের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সচকিত। দুর্দশার বেদনায় অশ্রুসজল চোখে কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও হেমচন্দ্রের মতো ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া অন্তরের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা সুকান্ত করেন নাই। একটা গভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় সংকল্প তার সকল কবিতাকে শাণিত ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

সুকান্তের কাব্যশিল্পেরও একটি নূতন ভঙ্গি ব্যক্ত হইয়াছে ঃ ইহা তার মূল জীবনদর্শনেরই প্রকাশ। আধুনিক বাংলা কাব্যে অনুপ্রাসের যে কানভোলানো আবেশ রহিয়াছে, সুকান্তের কবিতায় তা প্রায় নাই। ধ্বনিসঙ্গতির মসৃণ মধুর সুর পাঠকমনকে সজাগ করেনা, মৃদু ঝংকারে আনন্দের মৃদু মধুর আবেশে বিধুর তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুকান্তের কবিতার ভাবগুলি মনকে উচ্চকিত দুর্দম জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করে ঃ এখানে তন্দ্রাবেশের পরিবেশ নাই, নাই কল্পনার ভাববিলাস। তাই অনুপ্রাসের শ্রুতিসুখবিধুর সুরঝংকার তার কাব্যে বাজিয়া উঠে নাই। সুকান্তের উপমাগুলিও নূতন ব্যঞ্জনা আনে ঃ 'পদ্যের কড়া হাতুড়ি', 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি', 'পল্টন-ফসল', 'বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার ভয় করে গুজবের ডানা', 'বিক্ষুব্ধ টাইফুনমত চঞ্চল ধমনী', 'মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ', 'খববপরী'। কাব্যের ভাষা বলিষ্ঠ ঃ সংস্কৃতঘেঁষা বলিয়া ইহাতে আসিয়াছে শক্তি ও শালীনতা। ভাষার ভাবব্যঞ্জনা সীমাবদ্ধ কিন্তু স্পষ্ট ঃ রোমান্টিক কাব্যের ভাব-ব্যঞ্জনা কল্পনার অস্পষ্ট অসীম জোৎস্নাপ্লাবিত ইন্দ্রপুরী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; সুকান্তের ভাষার ব্যঞ্জনা মধ্যাহ্ন ভাস্করের আলোর স্পষ্টতা ও দীপ্তি লইয়া আসে। তার কাব্যে যে বৈপ্লবিক বিশ্বাস ও সংকল্প দেখি তাহাতে বেদনা বিলাস নাই, নাই ভাবের উচ্ছ্বাস। মিলছন্দের সুদৃঢ় পদক্ষেপ তার

কাব্যে লক্ষনীয় ; মুক্তক ছন্দের স্বাধীন গতিতে একটি অবিচল দৃঢ়তা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা কাব্যের শিল্পিক কনভেনশন ভাঙিয়াছেন ; কিন্তু তার কবিকল্পনা রোমান্টিক ও মিষ্টিক জগৎ ছাড়িয়া আসিতে কুণ্ঠিত। সুকান্তের অনুভূতি প্রত্যক্ষ বিশ্বের দৈনিক জীবনের অলি-গলিতে মানুষের ভিড়ে ঢুকিয়া পড়ে। যেসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন সে-সব কাব্যে কল্পনার গোঁড়ামি কমিয়া আসিয়াছে সত্য, শান্তিনিকেতনের আমকুঞ্জ তালবন ও শালবীথি হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়া কবি কলিকাতার ধূলিধূসর রাজপথে জনগণের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্চকিত ভিড়ের কাছাকাছি মাঝে মাঝে হৃদয়ের উদার সহানুভূতি ও মানবতার ক্ষণিক প্রেরণায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তবু ভিতরে প্রবেশ করিবার শক্তি তার ছিলনা। কিন্তু সুকান্ত একেবারে ভিড়ের ভিতরে ঢুকিয়া জনতার কণ্ঠের সারিগান শুরু করিয়াছেন।

সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবন সংগ্রামের তীব্র উদ্দীপনা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ থাকিলেও সুকান্তের ভাষা ও কাব্য-শিল্প ঠিক জনগণের বাস্তবজীবন পরিবেশ অপেক্ষা বিদগ্ধ শিক্ষিত মনের সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর কাছাকাছি বেশী। তবু তার কাব্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, নাই মিষ্টিসিজম ;

স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবানুভূতি ধাক্কা দিয়া মনকে সজাগ ও সচকিত করিয়া দেয় ; সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনের একটি বিশেষ পরিণাম লাভের জন্য সমবেত প্রয়াসের প্রচণ্ড একটা উল্লাস সমগ্র তার কাব্যে ফাটিয়া পড়িতেছে।